বিপ্লবী জীবন সংগ্রামে
কমরেড শিবদাস ঘোষের
শিক্ষাকে পাথেয় করুন

প্রভাস ঘোষ

(৫ আগস্ট ২০২১-এর ভাষণ)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

বিপ্লবী জীবন সংগ্রামে কমরেড শিবদাস ঘোষের
শিক্ষাকে পাথেয় করুন — প্রভাস ঘোষ

প্রথম প্রকাশ ঃ ৫ অক্টোবর, ২০২১

প্রকাশক ঃ অমিতাভ চ্যাটার্জী
সদস্য, পলিটব্যুরো, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ , লেনিন সরণি, কলকাতা- ৭০০০১৩

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ১০ টাকা

প্রকাশকের কথা

সর্বহারার মহান নেতা, বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ৫ আগস্ট, ২০২১, সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হল।

ধন্যবাদান্তে

সেপ্টেম্বর ২০২১

অমিতাভ চ্যাটার্জী
সদস্য, পলিটব্যুরো

বিপ্লবী জীবন সংগ্রামে

কমরেড শিবদাস ঘোষের

শিক্ষাকে পাথেয় করুন

কমরেডস ও বন্ধুগণ,

আজকের এই দিনটি স্মরণ দিবস হিসাবে আমরা উদ্‌যাপন করি আমাদের প্রয়াত মহান শিক্ষক, এই যুগের সর্বহারা মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শক, বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এবং তারই সাথে তাঁর অসাধারণ বৈপ্লবিক সংগ্রামের কিছু অধ্যায় ও কিছু অমূল্য শিক্ষা স্মরণ করি তাঁর ছাত্র হিসাবে আমাদের বিবেককে জাগ্রত করার জন্য। আজ পশ্চিমবঙ্গে বহু অফিসে, বহু ঘরে সেণ্টারে মাল্যদান করতে গিয়ে তাঁর একটা মূল্যবান আলোচনার ক্ষুদ্র অংশ পড়া হয়েছে। এটা এখন প্রকাশ হওয়ার পথে। সেই বক্তব্যের শেষ অংশটা পড়েই আমি শুরু করতে যাচ্ছি। তিনি বলছেন, ‘‘আমি জানি আমাকে হয়তো না খেয়ে মরতে হবে। একটা লোক না খেয়ে মরছে কিনা তার খবরটাও হয়তো কেউ নিতে আসবে না। কিন্তু কী করব? ভাবব যে এমনটা যে হল সেটা আমার অক্ষমতা। অক্ষমতার লজ্জা একরকম আর বিবেক বিকিয়ে দেওয়াটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র্য জিনিস। আমি পারিনি কিন্তু কোনও অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়াইনি, সাধ্যমত আমি লড়েছি কিন্তু তবু পারিনি, হয়তো না খেয়ে মরে গেলাম শুধু, কিন্তু কিছু করতে পারলাম না। আবার এটাও তো ঠিক কোনও কিছুই বিফলে যায় না। সকল বিপ্লবীই জানে এই যে সে না খেতে পেয়ে নিঃশব্দে মরে গেল, পাঁচটা লোকের মধ্যে, পঞ্চাশ একশোটা লোকের মধ্যে সে শুধু এই কথাটাই বলে গেল যে যথার্থ বিপ্লবী আদর্শ ও দল ছাড়া কিছু হবে না। এই আবেদন ব্যর্থ হয় না, ব্যর্থ হতে পারে না।’’ এই বক্তব্য কমরেড শিবদাস ঘোষের ১৯৪৫-৪৬-৪৭-৪৮ সালের কথা। তাঁর এই সংগ্রাম যে ব্যর্থ হয়নি, সেটা ইতিহাসে আজ প্রমাণিত। আজকের এই দিনটি ভারতবর্ষের ২৮টি রাজ্যে দলের হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা সহকারে উদ্‌যাপন করছে। ভারতবর্ষের বাইরে বাংলাদেশেও আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি বাসদ (মার্কসবাদী)ও উদ্‌যাপন করছে। এমনকী আমি এও শুনেছি, পড়াশোনা করার জন্য বা অন্য কোনও কাজে ভারতবর্ষের বাইরে অন্য দেশে যারা গেছে, তারাও কমরেড শিবদাস ঘোষকে স্মরণ করছে, তাঁর ছবিতে

মাল্যদান করছে। এই যে কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষার আবেদন, তা কোনও দিন কোনও সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে যায়নি, অর্থশক্তির জোরে যায়নি, এমএলএ, এমপি'র শক্তিতেও যায়নি। ইতিহাসে বারবার প্রমাণিত হয়েছে, সমাজের মুক্তির প্রয়োজনে যে সত্য আবিষ্কৃত হয়, সেই সত্যের শক্তি অমোঘ। যত দিন যায়, তার শক্তি বাড়তেই থাকে।

১৯৭৬ সালে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। তারপর প্রতি বছর এই দিনটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই দিনটিতে যাঁরা শপথ নিয়েছিলেন তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী চলবেন, তাঁদের একদল আজ আর নেই। কিন্তু আমি জানি, শেষ নিঃশ্বাস ফেলার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই চিন্তাই তাঁরা করে গেছেন যে ৫ আগস্ট যে শপথ নিয়েছিলাম কতটুকু সফল করতে পেরেছি। এমনকি গতবছরও যাঁরা এইদিনে কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেছেন, তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশের মহান বিপ্লবী যোদ্ধা, কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী আজ নেই। আমাদের দলের পলিটব্যুরোর সদস্য কমরেড শঙ্কর সাহা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক কমরেড ধূর্জটি দাস, আসামের কমরেড ভূপেন্দ্রনাথ কাকতি, মধ্যপ্রদেশের কমরেডস জে সি বরাই, হিমাংশু শ্রীবাস্তব, কর্ণাটকের কমরেড রবি শঙ্কর, বিহারের কমরেড অশোক সিং, পশ্চিমবঙ্গের কমরেডস অচিন্ত্য সিংহ, গোপেশ মহন্ত, দেবেন্দ্রনাথ বর্মন, কাজল চক্রবর্তী, সুব্রত দত্তগুপ্ত, নুরশেদ আলি, কুদ্দুস আলি, আতাহার রহমান, সলিল সেন — এই কমরেডরাও গতবছর মাল্যদান করেছেন, আজ তাঁরা নেই। আবার আগামী বছর ৫ আগস্ট আসবে যখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ থাকবে না। আবার তার পরের বছরেও অনেকেই থাকবে না। একদল প্রয়াত হবেন আবার বহু নবাগত তরুণ প্রাণ আসবে। তারাও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ঝাণ্ডা বহন করে যাবে। এই দিনটি স্মরণ করে তাঁরা শক্তি সঞ্চয় করবে। বিপ্লব সফল হওয়ার পরেও সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষে এই দিনটি উদ্‌যাপিত হবে। সেদিনের মানুষও এর থেকে শক্তি সঞ্চয় করবে। মহান নেতা সেদিন যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন সেই সংগ্রাম ব্যর্থ তো হয়ই নি, বরং দিনের পর দিন শক্তি সঞ্চয় করে এগিয়ে চলেছে। ইতিহাসে এক একটা সময় আসে যখন সমাজ অভ্যন্তরে সামাজিক সঙ্কটের তীব্রতা পরিবর্তনের আহ্বান নিয়ে আসে। সেই আহ্বান মানুষের মননে অনুভূত হয়। মুক্তির আকুতি বারবার ব্যক্ত হতে থাকে। এই যুগসন্ধিক্ষণে এই ব্যথাবেদনা, এই প্রয়োজনীয়তা, মুক্তির আবেদন, আকুতি যাঁদের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়, তাঁরা হচ্ছেন সেই যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক। যুগ পরিবর্তনের পথে, সমস্যা সঙ্কট পরিবর্তনের মাধ্যমে মুক্তির আবেদনের চরিত্র ও রূপ পাল্টায়। ভারতবর্ষের একটা বিশেষ সময়ে একদিকে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে রামমোহন দিয়ে নবজাগরণের যাত্রা শুরু।

অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সামন্ততান্ত্রিক, বন্ধ্যা এবং ভাবজগতে শৃঙ্খলিত এই ভারতবর্ষকে ইউরোপীয় নবজাগরণের ভাবধারায় যাদুদণ্ডের স্পর্শে প্রথম যিনি প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন তিনি রামমোহন, তাঁর পথে আরও বহুদূর অগ্রসর হয়ে বিদ্যাসাগর, মহাত্মা ফুলে এবং তারও পরে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, প্রেমচাঁদ, সুব্রমণিয়াম ভারতী — এই যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন, এর মধ্যে বিদ্যাসাগর-শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ ধর্মীয় চিন্তার প্রভাবমুক্ত মানবতাবাদ আর অন্যরা ধর্মকে কুসংস্কারমুক্ত করে গণতান্ত্রিক চিন্তার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছিলেন। এটা একটা সংগ্রাম সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে। আর রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিল আপসমুখী, আপসহীন ধারা। এই আপসহীন ধারা বিপ্লবী ক্ষুদিরাম দিয়ে যার সূচনা এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র সহ আরও অনেককে নিয়ে এই ধারা। এই সবটা মিলিয়ে ভারতবর্ষে সেই সময় স্বাধীনতা আন্দোলন চলছিল যে স্বাধীনতা আন্দোলনের আবেদন শহর থেকে দূরদূরান্তরে পল্লীগ্রামেও অনেক কিশোরের ঘুম ভাঙিয়ে ছিল। তাঁদের অন্যতম হলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। কৈশোর থেকেই তিনি স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লববাদে দীক্ষিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ভারতবর্ষের নবজাগরণের যুগের, স্বদেশী আন্দোলনের যুগের যাঁরা দিকপাল ছিলেন প্রত্যেকের থেকেই যতটা শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি তিনি সুদূর অতীতের বড় মানুষদের জীবন থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। আবার এই শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে তিনি এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মতবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সংস্পর্শে আসেন, তার প্রতি আকৃষ্ট হন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চর্চা করতে গিয়ে তাঁকে বহু সংগ্রাম করতে হয়েছে। তিনি প্রথাগত শিক্ষার বিশেষ সুযোগ পাননি। কিন্তু সত্যানুসন্ধানী মন নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানার স্পৃহা ছিল তাঁর খুবই। আমি তাঁর সহকর্মীদের কাছে শুনেছি, জেলজীবনে লেনিনের বই পড়া হত ইংরাজিতে। ইংরাজি থেকে বাংলা অনুবাদ যিনি করতেন কখনও কখনও কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন, অনুবাদ ঠিক হয় নি, লেনিন এই কথা বলতে পারেন না। অন্যরা বিস্মিত হয়ে দেখতেন যে সত্যিই তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। বেদান্ত নিয়ে তাঁর সাথে এক পণ্ডিতের আলোচনা হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁকে বললেন বেদান্তের মূল বক্তব্য আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলুন। বুঝিয়ে বলার পরে কমরেড শিবদাস ঘোষ একটার পর একটা যুক্তি দিয়ে তাঁর বক্তব্য খণ্ডন করলেন এবং দেখালেন বেদান্ত কেন ভ্রান্ত। বেদান্ত সম্পর্কে ওই পণ্ডিত ব্যক্তির কাছ থেকে বক্তব্য শুনে বুঝে তারপর তিনি খণ্ডন করলেন। তিনি বয়সে বৃদ্ধ এবং বড়মনের মানুষ ছিলেন। তিনি বললেন ব্রহ্মই যে সত্য, তার প্রমাণ তুমি। কারণ তুমি যে জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছ, আমার কাছ থেকে শুনে যেভাবে ব্যাখ্যা করছ, এখানেই বোঝা যায় ব্রহ্মের শক্তি। সেই ব্রহ্মের শক্তি তোমার মধ্যে কাজ করছে।

আমি এই কথাটার মধ্য দিয়ে বলতে চাইছি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু জানা বোঝা একেবারে কৈশোর থেকেই তিনি শুরু করেছিলেন বিপ্লবের প্রয়োজনে, সমাজমুক্তির প্রয়োজনে। জেলজীবনে আরেকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটেছিল। কমিউনিজম বিরোধী কয়েকজন গান্ধিবাদী বলেছিলেন, কমিউনিস্টরা নীরস, সঙ্গীতের মাধুর্য বোঝে না। এর উত্তর তিনি দিলেন। কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির নির্দেশ এল। তাঁদের বিদায় সম্বর্ধনার অনুষ্ঠানে কমরেড শিবদাস ঘোষ সবাইকে অবাক করে সেতার বাজিয়ে শোনালেন। জীবনে সেই প্রথম ও শেষ। কখন কীভাবে শিখেছেন, অনেকে টের পাননি। এটা করলেন প্রমাণ করার জন্য কমিউনিস্টরা সঙ্গীত রসিক এবং তাদের অসাধ্য কিছু নেই। মতপার্থক্য যাই ঘটুক, জেলের বন্দীরা তাঁর প্রতি খুবই আকৃষ্ট হতেন, বয়স্করা তাঁর শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণে ও তাঁদের প্রতি কর্তব্য পালনে, আর সমবয়সীরা স্নেহ-ভালবাসার সৌজন্যে।

আরেকটা কথাও তিনি বলেছিলেন যেটা আমরা প্রায় সবাই জানি। বলেছিলেন, এই পথে এলাম কেন? নিজেই উত্তর দিয়েছিলেন, বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। কোটি কোটি জানা অজানা শোষিত মানুষের যে চোখের জল, ব্যথাবেদনা, সেটাই তাঁর মনকে পীড়িত করেছিল, উদ্বেলিত করেছিল। তিনি যখন ঘর ছাড়েন, নিম্নবিত্ত, অভাবী পরিবারের তিনি বড় ছেলে। বাবা-মাকে তিনি খুবই ভালবাসতেন। তাঁরাও ওঁনাকে বিশেষ স্নেহ করতেন, নির্ভর করতেন। তিনি বলছেন, আমি জানতাম আমার বাবা-মাকে দেখার কেউ নেই। কিন্তু আমার মনকে আমি এমন প্রস্তুত করেছিলাম যে বিপ্লবের কাজে আমি কোথাও মিটিংয়ে যাচ্ছি, হয়তো দেখছি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার বাবা-মা ভিক্ষা করছেন, তখন আমি কী করব? আমি ফিরে যাব? না, আমি ফিরে যেতে পারি না। পথেঘাটে হাজার হাজার বাবা-মা কাঁদছেন, ভিক্ষা করছেন। আমি সকলের সন্তান। সকলের চোখের জলই আমার বাবা-মা'র চোখের জল। এগুলি তাঁর প্রথম জীবনের কথা। এমনকি কিছু কিছু কমরেড জানেন, নতুনরা অনেকেই জানেন না, তাঁর অভাবগ্রস্ত বাবা-মা যখন খুবই সঙ্কটে, তাঁর প্রথম জীবনের এক বন্ধু সেই পরিবারকে কমরেড শিবদাস ঘোষের নামে আর্থিক সাহায্য দিতেন। তাঁরা জানতেন যে শিবদাস ঘোষই পাঠাচ্ছেন। কারণ, না হলে ওঁনারা নিতেন না। কমরেড শিবদাস ঘোষ পরে এটা জেনে সেই বন্ধুকে ডেকে বললেন, আপনি এটা বন্ধ করুন। আমার বাবা-মা'র দায়িত্ব আপনি নিতে পারেন না। আমার দলে আরও কর্মী আছে যারা ঘরবাড়ি ছেড়েছে। আপনি যদি সকলের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন তাহলে আমার বাবা-মা'র দায়িত্ব নেবেন। স্বাভাবিকভাবেই সেই বন্ধু দুঃখ পেয়েছেন, ব্যথা পেয়েছেন, এও বলেছেন আপনি নিষ্ঠুর। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই। সত্য বলে যা বুঝেছেন, জীবনে কোথাও কোনও প্রশ্নে তিনি এতটুকু আপস করেননি। সেই কথাই এখানে

ব্যক্ত হয়েছে। এখন একটা বই থেকে পড়ছি। আপনারা অনেকেই সেই বই পড়েছেন। তবুও নতুনদের জন্য এবং নিজেদের বিবেককে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি পড়ছি। ''গোড়াতে যখন আমরা দল গড়ার কাজ শুরু করেছি, যখন সমর্থনে বিশেষ লোকজন ছিল না, এমনকি মাথাগোঁজার মত ঘরও জোগাড় করে উঠতে পারিনি, যখন না খেয়ে দিনের পর দিন একটা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে আমাদের একটা নতুন পার্টি গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে, এই নিয়ে সেদিন আমাদের মনে কোনও ক্ষোভ ছিল না। আমরা কত বছর মাদুরে শুয়েছি, কত শীত-গ্রীষ্ম আমাদের এভাবে কেটেছে, আমাদের তখনকার বন্ধুরা আজও তার সাক্ষ্য বহন করবে। তারা দেখেছে তখনও আমাদের মনে কোনও আক্ষেপ ছিল না। আমরা কতদিন খাইনি, তা নিয়ে আমরা কারও কাছে কিছু বলতেও লজ্জাবোধ করতাম। কারণ মনে হত, খাবার জোগাড় করতে পারিনি, সমর্থক নেই, পাঁচটা পয়সা চাঁদা তুলতে পারিনি, লোকে দেয়নি, এটা আমাদেরই অক্ষমতা। এটার মধ্যে আবার গর্ব করে বলার কী আছে! ত্যাগের কী মাহাত্ম আছে? এ বলতেই আমরা লজ্জাবোধ করতাম। এ এক ধরনের মনোভাব আমাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু এ নিয়ে আমাদের মধ্যে গর্বের কোনও মনোভাব ছিল না যে দেশের জন্য আমরা মস্ত ত্যাগ করছি। বরঞ্চ ছিল কাজের অক্ষমতা, অসফলতা সম্বন্ধে মনের মধ্যে লজ্জাবোধ।'' এই দিনগুলি কিছুটা আমিও প্রথমদিকে প্রত্যক্ষ করেছি। আমি দেখা করতে গিয়েছি। চাল জোগাড় হয়নি, কমরেড নীহার মুখার্জী কিছু চিড়ে এনেছেন। চিড়ে ভিজিয়ে সরবত করে সকলে খেয়েছেন। আমি এইরকম ঘটনার সাক্ষী। উনি ফুটপাতে কাটিয়েছেন। কোলে মার্কেটের ছাদে কাটিয়েছেন। আমি জানলাম কী করে? বসুমতীতে কাজ করতেন একজন সাংবাদিক, থাকতেন কোলে মার্কেটে একটা ঘরে। তিনি সেইযুগে কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি দেখা করতে চেয়েছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে। আমি কমরেড শিবদাস ঘোষকে কোলে মার্কেটে নিয়ে গিয়েছিলাম। উনি হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, কোলে মার্কেট আমার চেনা। ওখানকার ছাদে কিছুদিন আমি রাত কাটিয়েছি। এরকম করে দিন কাটিয়েছেন। এখন আমাদের কর্মীদেরও লোকে বহু জায়গায় ডাকে, আদর আপ্যায়ন করে, থাকতে বলে, না থাকলে অভিমান করে, সাধ্যমত ভাল করে খাওয়াবার চেষ্টা করে আমরা তাঁর ছাত্র বলে, তাঁর শিক্ষা যতটুকু পারি বহন করছি বলে। আর আমাদের মহান নেতা দিনের পর দিন স্টেশনে কাটিয়েছেন, ফুটপাতে কাটিয়েছেন, অনাহারে কাটিয়েছেন। এই সংগ্রাম কীসের জন্য? এই সংগ্রাম তিনি করেছেন নবজাগরণের যাঁরা দিকপাল ছিলেন, তাঁদের অপূর্ণ স্বপ্নকে সফল করার জন্য। এই সংগ্রাম তিনি করেছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে আপসহীন ধারার যাঁরা বিপ্লবী তাঁদের স্বপ্নকে সফল করার জন্য। এই সংগ্রাম তিনি

করেছিলেন, এদেশে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। আবার তিনি এই কথা বুঝেছিলেন এই স্বপ্নকে সফল করতে হলে এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ মার্কসবাদ ছাড়া হবে না।

স্বাধীনতা আন্দোলনে কেন এত গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম সত্ত্বেও এদেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পরিবর্তে পুঁজিবাদী শোষণ কায়েম হতে চলেছে, কেন যথার্থ শোষণমুক্ত সমাজ আসছে না, কেন একটা কমিউনিস্ট পার্টি বলে পরিচিত শক্তিশালী দল থাকা সত্ত্বেও এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে উঠতে পারল না, এই প্রশ্ন বারবার তাঁকে ধাক্কা দিয়েছে, ভাবিয়েছে। এর উত্তর খুঁজতে গিয়েই তিনি বুঝেছিলেন, ভারতবর্ষে যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলেছেন বা মার্কসবাদকে কেন্দ্র করে আরও যারা — আরএসপি, আরসিপিআই ইত্যাদি পার্টি গড়ে তুলেছেন, এদের কোনওটাই যথার্থ মার্কসবাদী পার্টি হয়নি। কেন হয়নি, কীভাবে তিনি যথার্থ মার্কসবাদকে প্রয়োগ করেছেন, লেনিনবাদকে প্রয়োগ করেছেন, এই সম্পর্কে আমি কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর স্মরণসভায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেগুলি আজ আর এখানে বলছি না। প্রত্যেক যুগে মহান পথপ্রদর্শকদের মুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজনে যেমন কঠিন কঠোর প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে; কমরেড শিবদাস ঘোষকেও লড়তে হয়েছে, এটা আমরা জানি। আবার লড়াইয়েরও অনেক পার্থক্য থাকে। সমস্যারও পার্থক্য থাকে। মহান মার্কস-এঙ্গেলস যখন প্রথম দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন উপস্থিত করছেন, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চিন্তা উপস্থিত করছেন, তখনও তাঁদের পাশে বিশেষ কোনও লোক ছিল না। মার্কসকেও অনাহারে বিনা চিকিৎসায় বহু দিন কাটাতে হয়েছে। এঙ্গেলস না থাকলে মার্কস হয়তো এই সঙ্কটে মারাই যেতেন। আবার মহান লেনিন যখন বিপ্লবী আন্দোলনের পথ প্রদর্শন করছেন, তাঁকে লড়তে হয়েছে তাঁর যাঁরা শিক্ষক ছিলেন একদিন, তাঁদের বিরুদ্ধে। প্লেখানভ, কাউটস্কি প্রমুখ যাঁদের কাছ থেকে তিনি একদিন মার্কসবাদের শিক্ষা নিয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধেই তাঁকে লড়তে হয়েছে। লেনিনের বইতে পাবেন, হোয়েন কাউটস্কি ওয়াজ মার্কসিস্ট, হোয়েন প্লেখানভ ওয়াজ মার্কসিস্ট — এইভাবে লেখা আছে। আবার এঁরা যে ভ্রান্ত তা প্রমাণ করতে তাঁকে খুব কঠিন লড়াই করতে হয়েছে। রাশিয়ার বুকে বলশেভিক পার্টি গঠন করতে গিয়েও তাঁকে প্রবল আদর্শগত সংগ্রাম করতে হয়েছে। সর্বহারা শ্রেণির পার্টি গঠনের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া তিনিই দিয়ে গেছেন, যে প্রক্রিয়াকে ক্ষয়িষ্ণু পচনশীল পুঁজিবাদ থেকে উদ্ভূত সমাজবিমুখ চরম আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিবাদের সময়ে আরও সমৃদ্ধ ও বিকশিত করে রূপায়িত করলেন লেনিনের ছাত্র মহান কমরেড শিবদাস ঘোষ। মার্কস-এঙ্গেলস পরবর্তীকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে, দর্শনের জগতে তত্ত্বগত ক্ষেত্রে অনেক প্রশ্ন অনেক সমস্যা এসেছিল যার উত্তর লেনিনকে দিতে

হয়েছে। আবার মার্কস-এঙ্গেলস পুঁজিবাদের নতুন স্তর সাম্রাজ্যবাদ দেখে যাননি। এই স্তরে মার্কসবাদী বিশ্লেষণ কী হবে তার উত্তরও লেনিনকে দিতে হয়েছে। মার্কস পরবর্তী যুগে সাম্রাজ্যবাদের স্তরে লেনিন মার্কসবাদকে আরও বিকশিত, সমৃদ্ধ ও উচ্চস্তরে উন্নীত করেছেন, যেজন্য তাঁর সুযোগ্য উত্তরসাধক স্ট্যালিন বলেছেন, 'সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে লেনিনবাদই হচ্ছে মার্কসবাদ'। আবার লেনিনের পক্ষে অনুকূল কিছু জিনিসও ছিল। আরএসডিএলপি পার্টির অন্যান্য নেতাদের মধ্যে তিনিও একজন নেতা ছিলেন এবং সাথে তিনি কিছু নেতাও পেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, রাশিয়ার অভ্যন্তরে তখন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জোয়ার চলছিল অনেকটা আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের মতই। ফলে সেইসময় বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ আপেক্ষিক অর্থে প্রগতিশীল ছিল। কমিউনিস্ট নৈতিকতা হিসাবে ছিল — বিপ্লব ও দলের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তি বা পরিবারের স্বার্থ গৌণ। এটাও তাঁকে সাহায্য করেছিল। আর সাহায্য করেছিল প্রথম মহাযুদ্ধ ইউরোপে বিশেষত রাশিয়ায় যে সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। জনগণ চাইছে এখনি যুদ্ধ বন্ধ হোক, শান্তি চাই, ক্ষুধার্ত মানুষ চাইছে রুটি, কৃষকরা চাইছে জমি, আর মানুষ চাইছে স্বাধীনতার অধিকার, লিবার্টি। এই স্লোগানগুলি তখন খুব জনপ্রিয় ছিল। রাশিয়ায় সদ্য পার্লামেন্ট (ডুমা) এসেছে তাও সার্বজনীন ভোটের ভিত্তিতে নয়। পার্লামেন্টের আফিমের নেশায় মানুষ তখনও আচ্ছন্ন হয়নি। রাশিয়ায় শ্রমিক আন্দোলন তখন সবে শুরু হয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদ, অর্থনীতিবাদ কিছুটা মাথাচাড়া দিচ্ছে। মূলত এই আন্দোলন মিলিট্যান্ট ছিল। এছাড়া আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব তেমন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এটা প্রমাণ করেই লেনিন রাশিয়ায় বিপ্লব সফল করলেন এবং তারপর ১৯১৯ সালে নিজেই তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা করলেন এবং এই ক্ষেত্রে বিপ্লবের সাফল্যও তাঁকে সাহায্য করেছিল। মহান স্ট্যালিনকেও লড়তে হয়েছে। লেনিন যখন মারা যান, তখনও বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিপদ থামেনি। রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রতিবিপ্লবীরা তখনও বাধা দিয়ে যাচ্ছে। অর্থনীতি তখনও খুবই দুর্বল। অন্যদিকে ক্ষমতালোভী ট্রটস্কি, কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, বুখারিন বারবার সমস্যার সৃষ্টি করছিল। তাদের বিরুদ্ধেও স্ট্যালিনকে কঠিন লড়াই চালাতে হয়েছে পার্টিকে রক্ষা করার জন্য। একটা অত্যন্ত অনুন্নত দেশকে দশ বছরের মধ্যে অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তারপরেও ষড়যন্ত্র হয়েছে, তাকেও মোকাবিলা করতে হয়েছে। তারপরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। সেই মহাযুদ্ধে কয়েক কোটি লোকের প্রাণ গিয়েছে। রাশিয়ার বহু শিল্প, খামার ধ্বংস হয়েছে। এই সবকিছু নিয়েই মহান স্ট্যালিন বিপ্লবকে ও সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করেছেন, শক্তিশালী করেছেন, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করেছেন। চিন পৃথিবীর খুবই অনুন্নত দেশ ছিল। ঐতিহাসিক লং রুট মার্চে

১২,৫০০ কিলোমিটার রাস্তা — জঙ্গল-নদী-পাহাড়পর্বত অতিক্রম করে বহু কষ্টে তাদের এগোতে হয়েছিল মহান মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে। বলেছেন, লং রুট মার্চ এক লক্ষ বিপ্লবী সৈনিক নিয়ে শুরু করেছিলাম, শেষপ্রান্তে যখন পৌছালাম তখন তাদের মধ্যে মাত্র বিশ হাজার বেঁচে ছিল। অনাহারে, দুরন্ত নদীর স্রোতে, প্রবল শীতে, বিনা চিকিৎসায়, শত্রুর আক্রমণে, বন্য জীবজন্তুর আক্রমণে আশি হাজার মানুষ মারা গেছে। যখন বলছেন, তখন তাঁর চোখে জল। কিন্তু মাও সে তুং বলছেন আমাদের শক্তি বেড়েছে। এক লক্ষ ছিল সৈনিক, কঠোর ও কঠিন সংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়ে এই বিশ হাজার হচ্ছে সেনাপতি, ফলে এবার আমরা জিতব। প্রায় নিরক্ষর অশিক্ষিত দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বোঝানো খুবই দুঃসাধ্য ছিল। আবার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে থাকায় চিনেও ব্যক্তিবাদ প্রগতিশীল ছিল। চিনে পার্লামেন্ট ছিল না, ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্টও তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছেন শুধু কয়েক মাস বাদে। তাঁর সাথে বেশ কিছু যোগ্য নেতাও ছিলেন। এইগুলি তাঁর অনুকূলে কাজ করেছে। দীর্ঘদিন গৃহযুদ্ধ চালিয়েছেন দেশের অভ্যন্তরে। বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে অত বড় দেশকে মুক্ত করলেন। আবার জীবনের শেষপ্রান্তে এসে দেখলেন রাশিয়ার মত চিনেও সর্বনাশ ঘটছে। সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে পুঁজিবাদ আসছে। তাঁর যারা ডান হাত-বাম হাত, তারাই পুঁজিবাদের সারথি হয়ে গেছে। আবার নতুন বিপ্লবের ডাক দিলেন এই মহান যোদ্ধা যাকে আমরা সাংস্কৃতিক বিপ্লব বলি। পরিপূর্ণ ভাবে সফল করার আগেই তাঁরও মৃত্যু ঘটে। আজ সেই চিন পুঁজিবাদী শুধু নয়, বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। যদিও কমিউনিস্ট তকমা নিয়ে আছে।

কিন্তু আমাদের মহান নেতা শুরুতে ছিলেন অপরিচিত সাধারণ কর্মী। তাঁকে সেরকম কেউ চিনত না, জানত না। তাঁর সাথে যে দু-পাঁচজন ছিলেন তাঁরাও সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাঁদেরও কোনও নাম-পরিচিতি কিছু ছিল না। অন্য পার্টিগুলো ছিল অনেক বড়, নেতারাও ছিলেন নামকরা। তিনি বলছেন, 'যেদিন আমি এই পার্টিটা শুরু করি অল্প কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে সেদিন সকলে হেসেছে। সিপিআই তখন সম্মিলিত একটা পার্টি। এই সিপিআইকে সাপোর্ট করেছে শক্তিশালী আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব, স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত পার্টি, মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চিনের পার্টি।' এই সাপোর্ট যে কতবড় শক্তিশালী, এখনকার নতুন কর্মীরা বুঝতে পারবেন না। তখন ভারতবর্ষে শিক্ষিত মহলে কমিউনিজমের বিরাট প্রেস্টিজ, স্ট্যালিন, মাও সে তুং অত্যন্ত প্রভাবশালী শ্রদ্ধেয় নেতা। যাকেই এস ইউ সি আই-এর কথা বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে, সাথে সাথে তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'আপনারা যদি সিপিআইকে যথার্থ কমিউনিস্ট বলে মনে করেন না, তাহলে

স্ট্যালিন, মাও সে তুং তাদের সমর্থন করছেন কেন? আপনারা কি তাঁদের মানেন না? আপনারা কি স্ট্যালিন, মাও সে তুং-এর থেকেও বেশি বোঝেন?' তখন উত্তর দিতে হয়েছে, 'স্ট্যালিন- মাও সে তুংকে আমরা শিক্ষক হিসাবে মানি কিন্তু সিপিআই-এর অমার্কসবাদী চরিত্র ও ভূমিকা তাঁদের জানা নেই।' এটা বোঝানো কত কঠিন ছিল সেদিন! এই সমস্যার সম্মুখীন লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুংকে হতে হয়নি। ১৯৭৬ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষের মৃত্যু হয়। পার্টি প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত আমরা মস্কো-পিকিংয়ের কোনও সমর্থন পাইনি। মস্কো-পিকিং যাদের সমর্থন করত, তারা যে কমিউনিস্ট নয় — এই কথাই প্রমাণ করে করেই তাঁকে এগোতে হয়েছে। আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব প্রথমে অবিভক্ত সিপিআইকে সমর্থন করত, পরবর্তীকালে সিপিআইকে সমর্থন করত শোধনবাদী রাশিয়ার নেতৃত্ব আর চিন প্রথমদিকে সিপিএমকে সাপোর্ট করত, তারপরে তারা তো নকশালদের সাপোর্ট করা শুরু করল। এইসব বাধার বিরুদ্ধে কমরেড শিবদাস ঘোষকে লড়তে হয়েছে। অন্যদিকে ভারতবর্ষে একটা শক্তিশালী পুঁজিবাদ বিরাজ করছে। এই শক্তিশালী পুঁজিবাদ রাশিয়া এবং চিনে ছিল না। চিনে তো পুঁজিবাদ ক্ষমতায়-ই ছিল না। রাশিয়ার পুঁজিবাদ বিপ্লবের সময় আমাদের দেশের তুলনায় দুর্বল ছিল। আমাদের দেশে তখন ব্যক্তিবাদ প্রতিক্রিয়াশীল। যেজন্য কমরেড শিবদাস ঘোষকে বলতে হয়েছে পুরানো কমিউনিস্ট মূল্যবোধে চলবে না, যে মূল্যবোধ ছিল বিপ্লবের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবেও ছিল সামাজিক স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ। কিন্তু ভারতবর্ষে তখন ব্যক্তি হয়েছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মসর্বস্ব সমাজবিমুখ। এই অবস্থায় কমরেড শিবদাস ঘোষকে বলতে হয়েছে এখনকার দিনের কমিউনিস্ট মূল্যবোধ হবে 'ব্যক্তিকে ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত হতে হবে'। সর্বহারা বিপ্লবী হতে হলে ব্যক্তিকে ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত হয়ে বিপ্লবের সাথে, সমাজের সাথে একাত্ম হতে হবে, শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা থেকে মুক্ত হওয়া নয়, এই সম্পত্তিভিত্তিক মানসিক ধাঁচা থেকেও মুক্ত হতে হবে। ভারতবর্ষের দীর্ঘদিনের পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি যেটা জনগণের মধ্যে এখনও আফিমের মত কাজ করে, লোকে পার্টিগুলিকে গালাগালি করে, ভোট দেওয়ার সময়ও গালাগালি করে বলে কেউ কিছু করবে না, কিন্তু আবার বলে ভোটটা দেওয়া চাই, ভোটটা নষ্ট করা যাবে না। গরিব মানুষ দূর থেকে পয়সা খরচ করে হলেও ভোট দিতে বাড়ি আসে। এই পার্লামেন্টারি মোহ থেকে মুক্ত করে বিপ্লবের শিক্ষা দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। ভারতবর্ষে দীর্ঘদিনের শ্রমিক আন্দোলন অর্থনীতিবাদ, সুবিধাবাদের ব্যাপক চর্চা করেছে। তার থেকে শ্রমিকশ্রেণিকে মুক্ত করে বিপ্লবী আন্দোলনের সামিল করানো — এইসব প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে কমরেড শিবদাস ঘোষকে লড়তে হয়েছে। ফলে প্রত্যেকেরই

প্রতিবন্ধকতার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। লেনিন বলেছেন, মার্কস-এঙ্গেলস আদর্শগত ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন, পরিবর্তনশীল, চলমান জীবনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে হলে আমাদের সর্বদিকে তাকে বিকশিত করতে হবে। লেনিন এই কাজটি করেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষও ভারতবর্ষের মাটিতে ভাববাদ এবং ভাববাদী চিন্তা, ভারতবর্ষের বুর্জোয়া সংস্কৃতি, বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে লড়াই করে কেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ চাই তার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আবার শুধু এদেশেরই নয়, জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে বিশ্বে যেসব প্রশ্নগুলি এসেছে, লেনিন পরবর্তীকালে জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে, দর্শনের জগতে সাঁত্রে-রাসেল পর্যন্ত যেসব দার্শনিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছিলেন, তাঁদের কোথায় ভুল, কোথায় মার্কসবাদের শ্রেষ্ঠত্ব, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যেসমস্ত সমস্যা দেখা দিচ্ছিল যার ফলে সায়েন্টিফিক মিস্টিসিজম (বৈজ্ঞানিক মায়াবাদ) মাথা তুলছিল, তারও উত্তর তিনি দিয়ে গেছেন। যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গঠন পদ্ধতি কী হবে সে সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষাকে তিনি আরও উন্নত করেছেন। গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ কিভাবে আসবে, যৌথ নেতৃত্ব কিভাবে গড়ে উঠবে, যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত ব্যক্তিকরণ কিভাবে ঘটবে, সর্বহারা সংস্কৃতি কাকে বলে, সর্বহারা গণতন্ত্রের চরিত্র কী বৈশিষ্ট্য কী এইসব বহু বিষয় তিনি লেনিনের শিক্ষাকে ভিত্তি করে আরও সমৃদ্ধ করে গেছেন। আমাদের কমরেডদের এগুলি ভাল করে বুঝতে হবে, চর্চা করতে হবে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে ভালভাবে বুঝতে হলে।

১৯৪৮ সালে যখন তাঁর কোনও বাসস্থান ছিল না, মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক নিয়ে প্রায় অনাহারে থেকে পার্টি গড়ে তুলছিলেন, সেইসময় অসাধারণ মার্কসবাদী দূরদৃষ্টি নিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মুভমেন্টের গুরুতর সমস্যা দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ''বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের বহু সফলতা ও গৌরবময় আত্মত্যাগকে যথাযথ গর্ব ও শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করেও আমরা এর গুরুতর ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এক মূহুর্তের জন্যও ভুলে যাইনি। ... এই গুরুতর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দেখা দেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে, বিশ্ব সাম্যবাদী শিবিরের বর্তমান নেতৃত্ব বহুলাংশে যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত। ... যার ফলে চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী সাম্যবাদী নেতৃত্ব গড়ে ওঠার যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি মার্কসীয় বিজ্ঞানে ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতে স্বীকৃত হয়েছে, তা কার্যত পরিত্যক্ত হয়েছে। ... এতকাল বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টরা সংগঠনের একপেশে রুটিন কাজের ওপরই প্রধানত জোর দিয়ে এসেছেন, আদর্শগত চর্চার সাথে যুক্ত করে সংগঠন করার কাজকে একদম গুরুত্ব দেননি। অন্যদিকে, নেতারা কর্মীদের শুধু দলের প্রতি দায়িত্ব ও শৃঙ্খলার কথা (যা যান্ত্রিক শৃঙ্খলা ছাড়া কিছু নয়) এবং যে কোনও উপায়েই হোক, সংগঠন বাড়াবার

কথাই বলেছেন।'' সেদিনের তাঁর এই অবজার্ভেশন কত যে মর্মান্তিক সত্য ছিল, সেটা পরবর্তীকালের বিশ্ব সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী আন্দোলনের বিপর্যয় প্রমাণ করেছে। একদিকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও চিনের কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে ও অন্যদিকে সোভিয়েত ও চিনের নেতৃত্বের সাথে বিশ্বের অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের যথেষ্ট অভাব ঘটেছিল। যার ফলে রেনিগেড ক্রুশ্চেভ যখন সংশোধনবাদের পথে প্রতিবিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য মহান স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে ১৯৫৬ সালে রাশিয়ান পার্টির ২০তম কংগ্রেসে কুৎসা রটনা করেছিল, চিন সহ বিশ্বের সব কমিউনিস্ট পার্টিই অন্ধের মতো তাকে সমর্থন করেছিল, একমাত্র কমরেড শিবদাস ঘোষই প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯৫৬ সালের ২০ মে বলেছিলেন, ''কোনও সন্দেহ নেই যে, ক্রুশ্চেভের এই চিন্তা বিভিন্ন দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনে শোধনবাদী-সংস্কারবাদী প্রবণতার জন্ম দিতে সাহায্য করবে।'' পরে তিনি আরও বলেন, ''লেনিনবাদ সম্পর্কে স্ট্যালিনের উপলব্ধিই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঠিক উপলব্ধি, এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই সাম্যবাদী আন্দোলন বর্তমান স্তরে পৌছাতে সক্ষম হয়েছে। ... স্ট্যালিনের অথরিটিকে যদি অস্বীকার করা হয়, তাহলে ... এর দ্বারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে যাবতীয় প্রতিবিপ্লবী চিন্তাভাবনা আমদানির রাস্তা খুলে দেওয়া হবে এবং সাম্যবাদী আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তিটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এককথায়, এর দ্বারা মহান লেনিন তথা লেনিনবাদের মর্যাদাকেই কার্যত ভূলুণ্ঠিত করা হবে।'' ১৯৫৬ সালের ক্রুশ্চেভের বক্তব্যে বিশ্বের কমিউনিস্টরা প্রথমে বিস্মিত, বিমূঢ় ও হতবাক হয়েছিল। আবার অন্ধতার জন্য সোভিয়েত পার্টির বক্তব্যকে অগ্রাহ্যও করতে পারছিল না। এই সময়েই যদি মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চীনের পার্টি প্রকাশ্যে বিরোধিতা করত, তাহলে ক্রুশ্চেভের অপপ্রচার তত ক্ষতি করতে পারত না। ফলে বিশ্বের অধিকাংশ পার্টি অন্ধের মতো সোভিয়েত পার্টিকে অনুসরণ করে সংশোধনবাদে নিমজ্জিত হল। সাত বছর পরে চিনের পার্টি প্রকাশ্যে সোভিয়েত পার্টির সংশোধনবাদী লাইনের বিরোধিতা করল যখন ইতিমধ্যেই ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। এরপর বিশ্বের একদল কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত পার্টিকে, আরেকদল চিনের পার্টিকে সমর্থন করায় বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী হিসাবে বিভক্ত হয়ে গেল। কমরেড শিবদাস ঘোষ মূলত চিনের বক্তব্যকে সমর্থন করলেও তার কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি দেখিয়েছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় আমাদের দল সোভিয়েত ও চিনের পার্টির সাথে স্ট্যালিন ও মাও সে তুং-এর নেতৃত্ব থাকাকালীন দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বজায় রাখত। তিনি তাঁদের শিক্ষক হিসাবে শ্রদ্ধা করতেন এবং আমাদেরও শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছেন, আবার তাঁদের কোনও সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত মনে হলে আন্তর্জাতিকতার মানসিকতা নিয়েই

ব্যক্ত করতেন। ফলে আমাদের দল অন্ধের মত অনুসরণ করে মস্কোপন্থী বা পিকিংপন্থী ছিল না।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যে সঙ্কট দেখে কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর সংগ্রামী জীবনের সূচনা করেছিলেন এবং জীবনের শেষদিনও যে পরিস্থিতি দেখে তিনি অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন আজ যখন আমরা ৫ আগস্ট উদ্‌যাপন করছি, তখন গোটা বিশ্বে এবং ভারতবর্ষে সেইসব সঙ্কটের তীব্রতা, গভীরতা, ব্যাপকতা আরও বহু দিক থেকে সর্বাত্মক ও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা আমাদের বুঝতে হবে। পুঁজিবাদ একদিন সামন্ততন্ত্রের গর্ভে জন্ম নিয়ে প্রগতির ঝাণ্ডা নিয়ে এসেছিল, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আহ্বান ধ্বনিত করেছিল, রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র হবে — বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, অফ দ্যা পিপল — এই ঘোষণা করেছিল, মাল্টিপার্টি ডেমোক্রেসি নিয়ে এসেছিল। মাল্টিপার্টি ডেমোক্রেসি হচ্ছে পুঁজিবাদের সেই স্তর যখন একচেটিয়া পুঁজি আসেনি। তখন অসংখ্য ক্ষুদ্র পুঁজির স্তর ছিল। অসংখ্য ক্ষুদ্র পুঁজির অবাধ স্বাধীন প্রতিযোগিতাকে ভিত্তি করে মাল্টি ক্যাপিটাল, তাদের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের সংঘাতকে ভিত্তি করে মাল্টি পার্টি ও মাল্টি-পার্টি ডেমোক্রেসি এসেছিল। যদিও মার্কসবাদী হিসাবে আমরা জানি পুঁজিবাদের প্রথম যুগেও কখনই পুঁজিবাদ সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ঝাণ্ডা যথার্থভাবে বহন করতে পারেনি। ঐতিহাসিক কারণেই তা সম্ভব হয়নি। পুঁজিবাদ মানেই পুঁজিপতিশ্রেণি এবং শ্রমিকশ্রেণিতে বিভক্ত এই সমাজ। শ্রমিক পুঁজির দাস হিসাবে শৃঙ্খলিত ছিল, ফলে এই শ্রেণিবৈষম্যের মধ্যে যথার্থ সাম্য আসবে কোথা থেকে? কিন্তু তার মধ্যেও সেই যুগের প্রয়োজনে মাল্টিপার্টি ডেমোক্রেসিতে পুঁজিবাদকে যতটা প্রগতি এবং গণতন্ত্রের চর্চা করতে হয়েছিল তার খানিকটা সুযোগ শ্রমিকশ্রেণিও পেয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে ইতিহাসের নিয়মেই এই পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়েছে, লগ্নি পুঁজির জন্ম দিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উপনীত হয়েছে। এই যুগটাকে বিশ্লেষণ করেছেন মহান লেনিন। লেনিন বলেছেন আগে পুঁজিবাদ মোর অ্যাটাচড টু ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ফ্রিডম ছিল। এখন হচ্ছে মোর অ্যাচাটড টু ব্যুরোক্রেসি অ্যান্ড মিলিটারিজম। স্ট্যালিন মৃত্যুর আগে শেষ ভাষণে বলেছেন পুঁজিবাদ স্বাধীনতার ঝাণ্ডা, গণতন্ত্রের ঝাণ্ডাকে পদদলিত করছে। স্বাধীনতা বলতে পুঁজির স্বাধীনতা, শ্রমিক শোষণের স্বাধীনতা এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় গণতন্ত্র বলতে কিছু নেই। এখন ফ্যাসিবাদ কথাটা লোকের মুখে মুখে। এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ১৯৪৮ সালেই কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, ফ্যাসিস্ট সামরিক শক্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাস্ত, কিন্তু ফ্যাসিবাদ পরাস্ত হয়নি। তখন থেকেই উন্নত-অনুন্নত সব দেশেই ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইসময় অনেকেই এটা বিশ্বাস করতে পারেনি। অন্যান্য দলের নেতারা এটা নিয়ে

ঠাট্টা-বিদ্রুপও করেছেন। আজ কিন্তু তাদেরও বলতে হচ্ছে ফ্যাসিবাদের বিপদ, যদিও তার চরিত্র ও তাৎপর্য না বুঝেই। মার্কসবাদী চিন্তানায়ক হিসাবে ফ্যাসিবাদের তিনটি বৈশিষ্ট্যও তিনি দেখিয়েছেন। সেটা হচ্ছে, প্রথমত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজি কেন্দ্রীভূত হওয়া, পুঁজি বিকেন্দ্রীভূত থাকলে তার মধ্যে গণতন্ত্রের যতটা চর্চা করতে হয়, পুঁজি কেন্দ্রীভূত হলে সেই গণতন্ত্র অনেকটাই সঙ্কুচিত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লেজিসলেটিভ, জুডিসিয়ারির আপেক্ষিক স্বাধীনতা খর্ব করে আমলাতন্ত্র, মিলিটারির হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা। তৃতীয়ত, চিন্তার ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী মনন ও বিজ্ঞানধর্মী চিন্তাকে ধ্বংস করে নিয়ে আসছে অতীতের ধর্মীয় চিন্তা, অধ্যাত্মবাদী চিন্তা, শাশ্বত সনাতন সত্যের ধারণা এবং বিজ্ঞান শুধু থাকবে যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য, কারিগরি বিজ্ঞান চর্চার জন্য। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, ফ্যাসিস্ট শক্তি হেরেছে, ফ্যাসিবাদ হারেনি। ফ্যাসিবাদ আজকের যুগের পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য। যার থেকে আমরা বলছি কোনও পার্টি ফ্যাসিবাদকে আনে না, পুঁজিবাদ আনে। যে পার্টিই পুঁজিবাদের স্বার্থে কাজ করবে তার নাম যাই হোক, ঝাণ্ডার রঙ তার যাই হোক, শ্লোগান তার যাই হোক, ফ্যাসিস্ট বৈশিষ্ট্য সে কোনও না কোনও রূপে বহন করবেই। লেনিন বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পুঁজিবাদ হচ্ছে জরাগ্রস্ত পুঁজিবাদ। এ আর অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাতে পারে না। স্ট্যালিন বলেছিলেন, পুঁজিবাদ একটা সঙ্কট থেকে বেরোচ্ছে, আরেকটা সঙ্কটের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে। এই হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। একটা মন্দা যাচ্ছে, আবার কিছুদিন একটু তেজীভাব আসছে, আবার মন্দা আসছে। পুঁজিবাদের আপেক্ষিক স্টেবিলিটি আজ আর থাকছে না। আগে মন্দা চললেও যে স্টেবিলিটি ছিল, এখন আর তা নেই। আর পরবর্তীকালে কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, পুঁজিবাদের সঙ্কট হচ্ছে এবেলা-ওবেলার সঙ্কট। সকালবেলা একরকম, বিকালবেলা আরেক রকম। আর এখন আমরা প্রত্যক্ষ করছি পুঁজিবাদের সঙ্কট হচ্ছে প্রতি মুহূর্তের সঙ্কট। গোটা বিশ্বেই পুঁজিবাদ চূড়ান্ত ডিপ্রেশনে মানে অত্যন্ত শক্তিশালী মন্দার মধ্যে ডুবছে। মাথা তুলতে পারছে না। আট-দশ বছর আগে বলত, অ্যানিমিক রিকভারি। মানে রক্তাল্পতা রোগ, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরাই বলত। তারপর বলল, শ্লোয়িং ডাউন অফ ইকনমি। এখন বলতে হচ্ছে কমপ্লিট রিসেসন। পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির বাজার নেই। এই কথাটার অর্থ কী? বাজার নেই মানে ক্রেতা নেই। বহুদিন আগেই মার্কস বলেছেন, পুঁজিবাদই পুঁজিবাদের কবর সৃষ্টি করবে। শ্রমিককে শোষণ না করলে তার লাভ নেই। লাভ করতে হলে শোষণ করতে হবে। আবার সেই শ্রমিকই ক্রেতা। তার ক্রয়ক্ষমতা না থাকলে সে কিনবে কী করে? একচেটিয়া পুঁজির যুগে স্ট্যালিন বলেছেন শুধু অ্যাভারেজ প্রফিটে চলবে না। পুঁজিপতিদের চাই ম্যাক্সিমাম প্রফিট।

পুঁজিপতিদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। কে কাকে হারিয়ে জিতবে। যে ম্যাক্সিমাম প্রফিট করতে পারে, সেই জিতবে। আর প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশনের জন্য চাই ম্যাক্সিমাম এক্সপ্লয়টেশন। এক্সপ্লয়টেশন যত ম্যাক্সিমাম হচ্ছে বাজার তত সঙ্কুচিত হচ্ছে। মার্কস সেইসময় দেখিয়ে ছিলেন একজন মালিক শ্রমিককে ততটুকু মজুরিই দেয় যতটুকু দিলে সেই মজুর সপরিবারে ন্যূনতম খেয়ে পরিশ্রম করতে পারে। আজ কোনও মালিকই এইকথা চিন্তা করে না। শ্রমিক না খেয়ে মারা গেলে তার কী ক্ষতি? অসংখ্য বেকার ভিড় করছে কাজের জন্য। যেকোনও মজুরি দিয়েই সে শ্রমিককে ব্যবহার করতে পারে। শ্রমিক মজুরি নিয়ে বার্গেইনও করতে পারে না। মালিক যা মজুরি দেবে তাই তাকে মানতে হবে। মাল্টি ন্যাশানালদের ন্যাশানাল ইন্টারেস্ট বলে কিছু নেই। পুঁজিবাদের প্রথম যুগে রিজিওনাল ক্যাপিটাল, ন্যাশানাল ক্যাপিটালে রূপান্তরিত হয়েছে। তখন শ্লোগান ছিল, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ চাই, ফলে জাতীয় শিল্প চাই, জাতীয় স্বার্থ চাই। যেমন বিদেশি পুঁজির সাথে কম্পিটিশনে দাঁড়াতে না পেরে আমাদের দেশের জাতীয় পুঁজির স্বার্থেই শ্লোগান উঠেছিল, 'বিলাতি দ্রব্য বর্জন কর'। আজ সেই ভারতীয় পুঁজিবাদ একচেটিয়া স্তরে উপনীত হয়ে বিদেশে পুঁজি রপ্তানি করছে, বিদেশে কলকারখানা করছে। এখন বিভিন্ন দেশের একচেটিয়া পুঁজি একত্রিত হয়ে মাল্টিন্যাশানাল গড়ে তুলছে। যেদেশে লাভ হবে সেখানেই যাবে। ভারতীয় শিল্পপতি ভারতের শিল্প তুলে নিয়ে কেনিয়া চলে যাবে যদি সেখানে লাভ বেশি হয়। যেখানে সস্তা শ্রমিক ও কাঁচামাল পাবে সেখানেই যাবে। আউটসোর্সিং কথাটা আগে ছিলনা। বিদেশে সস্তায় পণ্য তৈরি করে এমনকি নিজদেশে বেশি দামে বিক্রি করছে। চিনে সবথেকে সস্তা শ্রমিক পাওয়া যায়। ফলে ওখানে আমেরিকা ইউরোপের মাল্টিন্যাশানালরা আউটসোর্সিং করছে। পার্মানেন্ট জব বলে কথাটা বিশ্বে এখন উঠেই যাচ্ছে। পার্মানেন্ট চাকরি, পার্মানেন্ট বেতন এই কথাগুলো এখন লুপ্ত হওয়ার পথে। এখন জোর দেওয়া হচ্ছে কন্ট্রাক্ট দিয়ে কাজ করানোর। কন্ট্রাক্টরের অধীনে যারা কাজ করে তাদের দিনরাত খাটায় অল্প মজুরি দিয়ে। কন্ট্রাক্ট লেবার, মাইগ্রেন্ট লেবার, আউটসোর্সিং এগুলো তো এখনকার দিনের ব্যাপার। মাল্টিন্যাশানালের ন্যাশানাল ইন্টারেস্ট ততটুকু যতটুকু হলে তার ন্যাশানাল বাজারটা হস্তগত হয় ও সেটা রক্ষা করা যায়। বিদেশে পণ্য উৎপাদন করলেও ন্যাশানাল বাজারটা তার চাই। আরেকটা হচ্ছে অন্য দেশে আধিপত্য বিস্তার করার জন্য ন্যাশানাল রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করা। এছাড়া জাতীয় স্বার্থ বলে তার আর কিছু নেই। পুঁজিবাদ আজ এই স্তরে এসে গেছে। আরেকটা বৈশিষ্ট্যও আজ চরমে উঠেছে। একদেশে যেমন এক একচেটিয়া পুঁজিপতিকে আরেক একচেটিয়া পুঁজিপতি তীব্র কম্পিটিশনে হারিয়ে নিজে এক নম্বর স্থান দখল করছে। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলিও একইভাবে বা ট্রেড ওয়ার বা অর্থনৈতিক

যুদ্ধ চালিয়ে প্রধানতম স্থান দখল করছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইংল্যান্ড ছিল প্রথম স্থানে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই স্থান দখল করে নিল। এরপর যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপান ও জার্মানি আবার মাথা তুলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কিছুটা কোণঠাসা করতে চাইল। কিন্তু এখন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত চিন দ্বিতীয় স্থান দখল করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। এরফলে সব দেশেই নিষ্ঠুরতম শ্রমিকশোষণ চলছে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য।

বিশ্বে দশ শতাংশ লোক সারা বিশ্বের ৮৪ শতাংশ সম্পত্তির মালিক। বাকি ৯০ শতাংশ লোক ১৬ শতাংশ সম্পদের মালিক। বিশ্বের এই হচ্ছে অবস্থা। বিশ্বের ৪০ শতাংশ লোক বেকার-অর্ধবেকার। আমাদের দেশে এক শতাংশ ধনী ৮০ শতাংশ সম্পদের মালিক। ৯০ শতাংশ কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত হচ্ছে ২০ শতাংশ সম্পদের মালিক। লক্ষ্য করুন, কীভাবে ক্যাপিটাল এবং ওয়েলথ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে! আমাদের দেশে ১০০ জন প্রধান কোটিপতি গত এক বছরে আয় বাড়িয়েছে ১২লক্ষ ৯৮হাজার ৮২২ কোটি টাকা। এই দেশে ৮০ কোটি গরিব মানুষ। গোটা বিশ্বে কোটি কোটি বেকার, কোটি কোটি ছাঁটাই শ্রমিক। ফলে পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি নিজেই বাজার ধ্বংস করছে। মাল্টিন্যাশানালদের আরেকটা আক্রমণ হচ্ছে মাঝারি, ক্ষুদ্র শিল্পকে ধ্বংস করা। মাল্টিন্যাশানালরা এখন আমাদের দেশে কৃষিজমিও দখল করতে যাচ্ছে, যেটা উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে আগেই করেছে। যার বিরুদ্ধে দিল্লিতে জীবনপণ করে কৃষকরা আন্দোলন চালাচ্ছে। মাল্টিন্যাশানালদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বড় বড় খামার করবে, তাদের ইচ্ছামত পণ্য উৎপাদন করবে বাজারের দিকে তাকিয়ে। এর জন্য জমি গ্রাস করবে, কৃষিজাত পণ্য গ্রাস করবে। আরেকটা আক্রমণ হচ্ছে ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন, ওয়ালমার্ট এরা সব খুচরা ব্যবসাদারদের ধ্বংস করে দিচ্ছে। ছোট দোকান, বাজার সব উঠে যাবে। চায়ের দোকান, মুদি দোকানও ওরাই চালাবে। এই হচ্ছে কনসেনট্রেশন অফ ক্যাপিটাল। একেবারে হায়েস্ট স্টেজে চলে গেছে। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস-এঙ্গেলস লিখেছেন যে তোমরা আমাদের কমিউনিস্টদের অভিযোগ করো যে আমরা ব্যক্তিমালিকানা উচ্ছেদ করছি। তোমরাই বরং ব্যক্তিমালিকানা উচ্ছেদ করছ। তোমরা অসংখ্য ছোট ছোট মালিকদের তো সর্বহারা করছ। আজ পৃথিবীতে বাস্তবে তাই ঘটছে। ফলে বেকার সমস্যা, কর্মের সমস্যার সমাধান পুঁজিবাদে নেই। এ বাড়বেই। সঙ্কট বাড়বেই। নাহলে পশ্চিমবঙ্গে ডোমের চাকরি করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, গ্র্যাজুয়েটরা সব দরখাস্ত করছে। সব রাজ্যেই, সব দেশেই এই অবস্থা। এরা সব রিক্সা চালায়, ভ্যান চালায়, রাস্তায় হকারি করে। এখানেই শুধু নয়, বিদেশেও তাই। কাজ কোথায়? এই পুঁজিবাদী সঙ্কট ভয়াবহ। অন্যদিকে আমাদের দেশে, অন্যান্য দেশে কোনও গণতান্ত্রিক অধিকার, প্রতিবাদ

করার অধিকার বলে কিছু নেই, যেকোনও আন্দোলন মিলিটারি, পুলিশ দিয়ে নৃশংস ভাবে দমন করছে। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির নামে চলছে ফ্যাসিস্ট অটোক্রেসি। যেকোনও প্রতিবাদ মানেই রাষ্ট্রদ্রোহিতা। বৈজ্ঞানিক চিন্তা, যুক্তিবাদী মননকে আক্রমণ করা প্রথম হিটলার শুরু করেছিল। আমাদের দেশে বিজেপি নেতারা আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে। তাদের দাবি, বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কার গীতা, রামায়ণ বেদান্তের যুগে হয়ে গেছে। হিটলার অন্তত এটা দাবি করেনি যে এইসব বাইবেলে ছিল। হিন্দু ধর্মের নামে আরএসএস-বিজেপি নেতাদের এইসব কথা শুনলে বিবেকানন্দও লজ্জা পেতেন। বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে তিনিও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ফলে আবার গীতা-রামায়ণ, মহাভারতের যুগে মানুষের মননকে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। ধর্মান্ধতা, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবিদ্বেষ, এগুলি উস্কানি দেওয়া হচ্ছে যাতে যুক্তিবাদী চিন্তা না থাকে, বৈজ্ঞানিক চিন্তা না থাকে, তর্ক করার, বিচার করার মন না থাকে। রাষ্ট্রকে, দলকে, নেতাকে অন্ধের মত মানো। এই মনটাকে তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। এটা একটা ভয়াবহ আক্রমণ চলছে। নবজাগরণের আহ্বানকে তারা কবর দিচ্ছে। এটা শুধু বিজেপি করছে তা নয়, কংগ্রেস থেকেই শুরু হয়েছে পুঁজিবাদের স্বার্থে। বিজেপি তাকে চূড়ান্ত জায়গায় নিয়ে চলে গেছে।

এখানে আর একটা কথা আমি বলে যেতে চাই। আমাদের দেশে একটা কথা চালু হয়েছে যেন বিজেপি বিরোধিতা মানেই সেক্যুলারিজম। যারা সেক্যুলার তারা বিজেপি বিরোধী অবশ্যই। কিন্তু বিজেপি বিরোধিতা মানেই কি সেক্যুলার? কংগ্রেস কি সেক্যুলার? আঞ্চলিক দলগুলি কি সেক্যুলার? সিপিএম-সিপিআই এদেরকেই 'সেক্যুলার' তকমা দিচ্ছে। সেক্যুলার কথার অর্থ কী? সেক্যুলার কথার অর্থ হচ্ছে রাজনীতির সাথে, অর্থনীতির সাথে, শিক্ষার সাথে ধর্মের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। সেক্যুলার কথাটার বাংলা মানেই হচ্ছে পার্থিব। মানে পার্থিব জগতই সত্য এর বাইরে কিছু নেই। ইউরোপে এই কথাটা এসেছিল নবজাগরণের যুগে। আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর এটাকে আপহোল্ড করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র রাজনীতির ক্ষেত্রে আপহোল্ড করেছেন, শরৎচন্দ্র চিন্তার ক্ষেত্রে আপহোল্ড করেছেন। ভগৎ সিং তো কেন আমি নাস্তিক বলে বই-ই লিখেছেন। বাকিরাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই কনটেন্টকে বহন করেছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মকে আনা ঠিক নয়, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, প্রেমচাঁদরা বলেছেন। এই দলগুলি কি সেক্যুলার? বিজেপি হিন্দুত্বের ধ্বজা উড়িয়েছে। তৃণমূল তো হিন্দু দেবদেবীরও পূজা করেছে আবার মসজিদে নামাজের আহ্বানের সময়ও হাজির হয়েছে। আবার ঈদের সময় হিজাব পরেও দাঁড়িয়েছে। সিপিএমও সেক্যুলার ফ্রন্ট করেছে এক পীরকে ডেকে মুসলিম ভোট পাওয়ার জন্য। এগুলি সেক্যুলারিজম? এই কথাটাও আমাদের বুঝতে হবে এবং

বোঝাতে হবে। যথার্থ সেক্যুলারিজম কাকে বলে? আমি আগেও বলেছি বিজেপি বিরোধী একটা ফ্রন্ট হচ্ছে, এটাকে সেক্যুলার ফ্রন্ট ভাবা একদম ঠিক হবে না। বিজেপি আজ ক্ষমতায় আছে, একসময় কংগ্রেস ছিল, তার বিরুদ্ধে বিজেপি-সিপিএম হাত মিলিয়েছিল। জনতা পার্টির মধ্যে তো জনসংঘ-আরএসএস ছিল, বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তি ছিল। তাদের সাথে ১৯৭৭ সালে সিপিএম ঐক্য করেছিল। পরে রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে ভিপি সিংকে বিজেপি ও সিপিএম যুক্তভাবে সাপোর্ট করেছিল। কলকাতা ময়দানে সিপিএম-এর জ্যোতি বসু আর বিজেপি'র বাজপেয়ী একত্রে মিটিং করে গেছে। এগুলি সব সেক্যুলার কাজ? এগুলি ভোটের স্বার্থে নিছক সুবিধাবাদ। সুভাষ বসু মার্কসবাদী ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজাদ হিন্দ বাহিনীর মধ্যে তিনি সেক্যুলারিজমের চর্চা করেছিলেন। বলেছিলেন, হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই এই গান চলবে না, কারণ তাহলে হিন্দুও থাকবে, মুসলিমও থাকবে। ফলে অনৈক্যও থাকবে। ধর্মীয় আচরণ আলাদা করতে পারে, কিন্তু আজাদ হিন্দ বাহিনীর মধ্যে সবাই ভারতবাসী। রেঙ্গুনে এক হিন্দু মন্দিরে নেতাজিকে বলেছিল আপনি আসুন, আপনাকে আজাদ হিন্দ ফান্ডে অনেক টাকা দেব, কিন্তু আপনার সাথে কোনও মুসলমান আসতে পারেব না। নেতাজি বলেছিলেন,এই শর্ত আমি মানব না, আমার টাকার দরকার নেই। পরে তারা নেতাজির কথা মানতে বাধ্য হয়েছিল। এই হচ্ছে সেক্যুলারিজম। নেতাজি তো ক্ষমতার লোভের জন্য এসব করেননি, ভোটের জন্যও করেননি। আর এই দলগুলির কাছে আগামী ভোটে কী ফল দাঁড়াবে সেটাই একমাত্র দেখার বিষয়। এখন বিজেপি'র বিরুদ্ধে ভোটে ঐক্যের জন্য যেসব দল দৌড়ঝাঁপ করছে, চা-পানের বৈঠক করছে, তারা সবাই বলছে যে আমি নেতা হতে চাই না, কিন্তু বাস্তবে প্রত্যেকেই নেতা হতে চাইছে। যে নেতা হতে চাইছে, সেও বলছে আমি নেতা হতে চাই না। মনে রাখবেন, আগামী নির্বাচনে যদি বিজেপি পরাস্তও হয়, তাহলেও ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িকতার আগুন, বর্ণভেদের আগুন ওরা জ্বালিয়ে দিয়েছে, যে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় মানসিকতা গড়ে দিয়েছে, তার বিষাক্ত প্রভাব থাকবেই। এরা মুখে যাই বলুক, যতই ধর্মীয় ভেক ধারণ করুক, প্রকৃতপক্ষে ভগবানও মানে না, কিচ্ছু মানে না। যথার্থ ভগবান মানলে কেউ এইসব কাণ্ড করত? মানে একমাত্র কীভাবে গদি দখল করা যায়, মন্ত্রীত্ব রক্ষা করা যায়। আমরা এর আগে আমাদের বিভিন্ন বইপত্রে দেখিয়েছি, বিজেপি নবজাগরণ বিরোধী, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী। আমাদের কর্মী-সমর্থকদের জানতে হবে বিজেপি স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে কী কী বলেছে। এমনকী বিজেপি হিন্দুধর্মের যারা প্রবর্তক, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের চিন্তারও বিরোধী। আমরা বলেছি, হয় বল ওরা হিন্দু, নাহলে তোমরা হিন্দু। দেশের মধ্যে যুক্তি করার মানসিকতা, তর্ক করার মানসিকতা, বিজ্ঞানধর্মী মননকে ধ্বংস

করার প্রক্রিয়া কংগ্রেসের আমল থেকে শুরু হয়েছে। সিপিএমও যখন ক্ষমতায় ছিল তারাও গায়ের জোর, দাপট, যুক্তিকে মারা, - এসবই করে গেছে। বিজেপি তো করছেই। আর সবথেকে বড় আক্রমণ যেটা মনুষ্যত্বের ওপর আক্রমণ চলছে। যে ইউরোপ, আমেরিকা একদিন সেক্যুলার মানবতাবাদের ঝাণ্ডা বহন করেছিল, ওদের সংবিধানে এখনও আছে, সেখানে আবার ধর্মান্ধতা জাগাচ্ছে। বর্ণবিদ্বেষের আগুন জ্বালাচ্ছে। ধর্মীয় মৌলবাদ, শুধু এদেশের হিন্দু ধর্মীয় মৌলবাদ নয়, অন্যান্য দেশে ইসলাম ধর্মীয় মৌলবাদ, খ্রীষ্ট ধর্মীয় মৌলবাদ, ইহুদি ধর্মীয় মৌলবাদ উস্কানি দিচ্ছে, সাংঘাতিকভাবে বর্ণবিদ্বেষের আগুন জ্বালাচ্ছে। বিবেক, মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ, ন্যায়নীতিবোধ যা মানুষের সম্পদ এগুলিকে ধ্বংস করছে। এটা ন্যায়, ওটা অন্যায়, এই কাজ করে আমার বিবেক দংশন হচ্ছে, আমি নিজের কাছে ছোট হয়ে যাব, এটা আমি পারি না, এই যে বিবেক দংশন — এসব লুপ্ত হচ্ছে। ব্যক্তির বিবেক আসে সমাজ বিবেক থেকে। সমাজ বিবেক ধ্বংস হলে ব্যক্তি বিবেক থাকে না। মানুষ তো বিবেক নিয়ে, মূল্যবোধ নিয়ে জন্ম নেয় না। অন্য প্রাণী তার বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্ম নেয়। মানুষ দৈহিক কাঠামো নিয়ে জন্ম নেয়। কিন্তু মন, মানসিকতা, চিন্তাভাবনা, ন্যায়অন্যায় বোধ, বিবেক মানুষ সমাজ থেকে পায়, পরিবেশ থেকে পায়। ধর্ম একদিন দিয়েছিল ধর্মীয় মূল্যবোধ। পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক বিপ্লব মানবতাবাদ দিয়েছিল। আমাদের দেশে স্বদেশি আন্দোলন মূল্যবোধ দিয়েছিল। আজকে বিশ্বে কোথাও এটা কাজ করছে না। চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, চূড়ান্ত স্বার্থপরতা, চূড়ান্ত মূল্যবোধহীনতা, বিবেকহীনতা চলছে। পুঁজিবাদ এনেছে মদ খাও, গাঁজা খাও, নেশা কর, নারী ধর্ষণ কর, গণধর্ষণ কর, হত্যা কর, ছয় মাসের শিশুকন্যা থেকে শুরু করে নব্বই বছরের বৃদ্ধা কেউই ধর্ষণ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। ধর্ষণের পর গলা টিপে মারছে। বাবা হয়ে মেয়েকে ধর্ষণ করছে। এই জিনিস তো আদিম সমাজেও ছিল না। এই জিনিস তো দাসপ্রথার যুগেও ছিল না। প্রাণীজগতেও নেই। এসব তো পশুরও অধম। এই কি সভ্যতার অগ্রগতি? এরা কার সৃষ্টি? এই পুঁজিবাদেরই সৃষ্টি। পুঁজিবাদ মানুষকে অমানুষ করছে যাতে তারা প্রতিবাদ করতে না পারে। লোভী, স্বার্থপর, যেভাবেই হোক টাকা রোজগার কর, খুন করে হোক, লুঠ করে হোক, কাটমানি খেয়ে হোক। বাবাকে মেরে সম্পত্তি দখল কর। বাবা-মা-ভাইকে পথে বসিয়ে দাও। বিয়ে করে বউকে বিক্রি করে দাও। বিয়ের নাম করে তাকে বের করে এনে বিক্রি করে দাও। নিজের বোনকে বিক্রি করে দাও। কোনও কিছু আটকাচ্ছে না। এই জিনিস দেখলে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্ররা কাঁদতেন। পাগল হয়ে যেতেন। এরা কেউই এইসব দেখে যাননি। গোটা বিশ্বকে আজ পুঁজিবাদ কোথায় নিয়ে গেছে। এই সঙ্কটের সূচনা নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ ওয়ার্নিং দিয়ে গেছেন। বলেছেন,

অভুক্ত, অর্ধভুক্ত থাকলেও মানুষ প্রতিবাদ করতে পারে যদি তার নৈতিক বল অটুট থাকে। যদি তার চারিত্রিক শক্তি থাকে। পুঁজিবাদ আজ সব ধ্বংস করে দিচ্ছে। পশু বানিয়ে দিচ্ছে। কমরেড শিবদাস ঘোষও এত ধর্ষণ, গণধর্ষণ, শিশুধর্ষণ দেখে যাননি। আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি শুধু নয়, যেন অভ্যস্ত হয়ে গেছি। প্রথমদিকে শুনলে, বিবেকের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য, মানসিক যন্ত্রণা হত, এখন দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে অনেকটা যেন স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে, এসব হচ্ছে, এগুলি হবেই। ও ঘুষ খাবেই, ছেলেমেয়েরা মদ খাবেই, রাস্তায় মেয়ে দেখলে ছেলেরা এসব করবেই। আর আরএসএস-এর প্রধান তো বলে দিয়েছেন, ধর্ষণ তো হবেই। মেয়েরা লক্ষণরেখা অতিক্রম করছে, সীতাকে রাবণ নিয়ে গেছে লক্ষণরেখা অতিক্রম করেছিল বলেই। ফলে মেয়েরা ঘরের বাইরে এলে এসব হবেই। তাছাড়া তিনি আরেকটা আবিষ্কার (!) করেছেন, এসব দুষ্কর্ম ইন্ডিয়াতে (শহরে) হয়, ভারতে (গ্রামে) হয় না। আর একজন স্বয়ংঘোষিত গডম্যান যিনি এখন জেলে আছেন রেপিংয়ের চার্জে, তিনি বলেছিলেন, কপালে থাকলে ধর্ষণ হবেই। এই হচ্ছে ধর্মপ্রচারকদের বিধান। ফলে এই অবস্থার মধ্যে হয় এটা চলতে থাকবে, বাড়তে থাকবে, না হয় একেবারে বন্ধ করতে হবে।

আরেকটা আক্রমণও হচ্ছে, যেটা উল্লেখ করা দরকার, জানেও অনেকেই, এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে সাংঘাতিকভাবে, এও তো পুঁজিবাদের আক্রমণ। পেট্রোল-ডিজেল-কয়লা-ফসিল অয়েল এসব পোড়ানোর ফলে যে কার্বন বেরোচ্ছে তা ওজন স্তর ধ্বংস করছে, পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ছে, মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে, হিমালয়ের গ্লেসিয়ার ধ্বংস হচ্ছে, সমুদ্রের জল বাড়ছে, সমুদ্রের জল একটু একটু করে পৃথিবীকে গ্রাস করছে বিভিন্ন জায়গায়, পৃথিবীর উষ্ণতা, বর্ষা, বন্যা, খরা ইত্যাদি বাড়ছে, সাইক্লোন, দাবানল বাড়ছে। কিন্তু কেউই গ্রীন হাউস গ্যাস কমাবে না, দূষণ কমাবে না। কারণ, লাভ চাই, টাকা চাই। পুঁজিবাদের এমন অবস্থা যে মানবসভ্যতার চরম ক্ষতি হলেও তার কিছু যায় আসে না। কিছু পশু আছে ঘাস খেতে গিয়ে শেকড় পর্যন্ত খেয়ে নেয়, তারপর মরুভূমি হয়ে যায়। হরিণের গর্ভে বাচ্চা আছে, বাঘ খেয়ে নেয়, সেই জঙ্গলে তারপরে আর হরিণ থাকে না। মানবজাতির চরম শত্রু পুঁজিবাদ আজ মানব জাতিকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে। স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা-মনুষ্যত্ব-বিবেক সব ধ্বংস করে দিচ্ছে। রাজনীতিকরা হচ্ছে ঠগ, মিথ্যাবাদী। কেউ কেউ লম্পট, সবাই ভণ্ড, প্রতারক। আবার এরাই দেশসেবক। এক একটা এমএলএ, এমপি কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছে। কিন্তু আরও টাকা চাই তাদের। এরাই হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জনগণের প্রতিনিধি! ইলেকশন নিয়ে ট্রাম্প কী কাণ্ড করল? ভোটে হেরেও বলল, আমি চেয়ার ছাড়ব না। আমেরিকা বিশ্বের সেরা গণতন্ত্র তো? রুশো-ভলটেয়ার-আব্রাহাম লিঙ্কন,

জেফারসন এসব দেখলে কী বলতেন? এই হচ্ছে আজ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নগ্নরূপ।

কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতবর্ষের জনগণকে শিখিয়েছেন কেন মার্কসবাদ চাই। যদি সত্য বুঝতে চাও, সমস্যার সমাধান করতে চাও, তাহলে একমাত্র পরীক্ষিত, প্রমাণিত বিজ্ঞানের পথ গ্রহণ করতে হবে, আর পরীক্ষিত প্রমাণিত বিজ্ঞানের পথ হচ্ছে মার্কসবাদ। মার্কস এগুলি হঠাৎ করে নিজ মস্তিষ্ক থেকে খুঁজে বের করেননি। মার্কসবাদ ইতিহাসের গতিপথে এসেছে। সমস্ত যুগের সমস্ত জ্ঞানের অগ্রগতির পথেই মার্কসবাদ এসেছে। একদিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, দর্শনের অগ্রগতি, অর্থনীতির অগ্রগতি, এইসব কিছু মিলিয়েই মার্কসবাদের অভ্যুত্থান। আমরা সমস্ত ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানকে ব্যবহার করছি, এই মাইকটা, এই বিদ্যুতের আলোটাও বিজ্ঞানের নিয়মেই চলছে, সকলেই বিজ্ঞান ব্যবহার করে। কৃষিতে বিজ্ঞান, শিল্পে বিজ্ঞান, যানবাহনে বিজ্ঞান, চিকিৎসায় বিজ্ঞান, নির্মাণশিল্পে বিজ্ঞান, এমনকী রান্নাঘরে রান্না করাটাও একটা বিজ্ঞান। এই টেবিলটা তৈরি করারও একটা বিজ্ঞান আছে। বিজ্ঞান মানে কী? বস্তুর নিয়মকে বুঝে বস্তুকে কাজে লাগান। বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হচ্ছে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে। মঙ্গলে যাচ্ছে বিজ্ঞানে, চাঁদে যাচ্ছে বিজ্ঞানে। ডার্ক ম্যাটার কী? ব্ল্যাক স্টার কী? গ্যালাক্সি কীভাবে মুভ করছে তাও বিজ্ঞান উত্তর খুঁজছে। বিজ্ঞান কোথায় নেই? সমস্ত ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ক্রিয়া করছে। মার্কসবাদ হচ্ছে বিজ্ঞানভিত্তিক। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, জুলজি, জিওলজি, বোটানি বস্তুজগতের এক একটা দিকের নিয়মকে বোঝার জন্য একেকটা বিজ্ঞান। কেমিস্ট্রির নিয়ম নিয়ে বায়োলজি বোঝা যাবে না, বায়োলজির নিয়ম নিয়ে জিওগ্রাফি বোঝা যাবে না। এক একটা ফিল্ডকে স্টাডি করার জন্য এক একটা বিজ্ঞান এসেছে। কিন্তু প্রত্যেকটি জায়গায় নিয়ম চলছে, বস্তু নিরন্তর গতিশীল, সেই গতির নিয়ম আছে। বিশেষ বস্তুর বিশেষ গতি স্টাডি করার জন্য বিশেষ বিজ্ঞান। মার্কস এই সমস্ত বিজ্ঞানগুলির গতির নিয়মকে একত্রিত করে মালার মত গেঁথে নিয়ে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় তার থেকে সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করলেন। যে সাধারণ নিয়মটা ঐসমস্ত বিশেষ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেই বিজ্ঞানকেই প্রয়োগ করে তিনি দেখালেন সমাজ পরিবর্তনেরও নিয়ম আছে। আদিম সমাজ থেকে আজকের পুঁজিবাদ কি হঠাৎ করে এসেছে? কারও খেয়ালে এসেছে? কেন রাজতন্ত্রের পরে আদিম সমাজ আসেনি? কেন আদিম সমাজের পর পুঁজিবাদ আসেনি? তার একটা নিয়ম আছে। সেই নিয়মটা আবিষ্কার করেছেন মার্কস। মার্কসবাদকে গ্রহণ করা মানেই হচ্ছে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করা। মার্কসবাদকে অস্বীকার করার মানে হচ্ছে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা। এই ভিত্তিতেই মার্কস দেখালেন শ্রেণিবিভাগ একদিন ছিল না। আবার একদিন আসবে যখন শ্রেণিবিভাগ থাকবে না। এরই ভিত্তিতে মার্কস দেখালেন পুঁজিবাদ ছিল না, পুঁজিবাদ থাকবে না। কেন থাকবে না, কোন

নিয়মে থাকবে না — এগুলি মার্কসবাদ দেখিয়েছে। অন্য দর্শন দিয়ে আমরা এইসব সব প্রশ্নের উত্তর বা সমাধান পাচ্ছি কি? কেউ বলছে মার্কসবাদ গ্রহণ করবে না, তাহলে বেদান্তের দ্বারা মুক্তি আসবে? গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কোরাণ, বাইবেল দিয়ে মুক্তি আসবে? সেখানে এসবের সমাধান আছে? এইগুলিতে বেকারি সমস্যা, ছাঁটাইয়ের সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা, ভর্তির সমস্যা, হাসপাতালের সমস্যা থেকে শুরু করে আইন আদালত, এখনকার যা সব সমস্যা, এককথায় আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যেসব সমস্যা, সেগুলি নিয়ে কোনও আলোচনা আছে? আজকের দিনের কোনও প্রবলেম নিয়ে আলোচনা নেই। আমরা ধর্মকে খাটো করি না। আমরা মার্কসবাদীরা ধর্মপ্রচারকদের শ্রদ্ধার চোখে দেখি। বরং বুর্জোয়ারা তাদের প্রথম যুগে, বেকন, হবস, স্পিনোজা, কান্ট সকলেই বলেছিল ধর্ম ইতিহাসের অ্যাবেরেশন, ফলে পরিত্যাজ্য। কিন্তু মার্কস বলেছিলেন, ধর্ম হচ্ছে শোষিত মানুষের চোখের জল। ধর্মীয় প্রতিবাদ অত্যাচারিত মানুষের প্রতিবাদ। ধর্ম এই হৃদয়হীন পৃথিবীতে হৃদয় এবং বিবেক এনেছে। তারপরের লাইন হচ্ছে ধর্ম হল আফিম, মানে সেই ধর্মকে পুঁজিবাদ আফিমের মত ব্যবহার করছে। মার্কসবাদী হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, ধর্ম কখন এসেছে? আদিম সমাজে ধর্ম ছিল না। আদিম সমাজে মানুষ বস্তুজগতের বাইরে, প্রকৃতির বাইরে কিছু জানত না। এই সত্য স্বয়ং বিবেকানন্দও লাহোর বক্তৃতায় স্বীকার করেছেন। এখনও অ্যাবঅরিজিনালদের মধ্যে এসব পাওয়া যায়। আন্দামানে, আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়, কানাডার জঙ্গলে অ্যাবঅরিজিনাল মানুষদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সম্পত্তির মালিকানা, ধনী-গরিব ভেদাভেদ এসব আসেনি, ঈশ্বর বিশ্বাসও আসেনি। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, কী মেটেরিয়াল কন্ডিশনে পরবর্তী সমাজ দাসপ্রথায় ধর্মীয় চিন্তা এসেছে। দাসপ্রথার যুগে দাসপ্রভুদের নির্দেশে সমাজ চলছে, এটাই নিয়ম। তখন মানুষ ভাবল, এই বিশ্বেও সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, জোয়ার-ভাটা, ঋতু পরিবর্তন, জন্ম-মৃত্যুও তো একটা নিয়মেই চলছে। এটা যখন মানুষ দেখল, তখন ভাবল তাহলে বিশ্বেরও প্রভু আছে। তিনি বলেছেন ধর্ম ন্যায়নীতিবোধ, পাপপুণ্যবোধ, কর্তব্যবোধ এগুলিকেও এনেছে। সমস্ত ধর্মপ্রচারকরাই তাদের যুগে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম ধর্ম দাসদের মুক্তির জন্য লড়েছিল। কিন্তু আজ ক্ষুধার্ত মানুষ কাঁদে, ধর্ষিতা-নির্যাতিতা নারী কাঁদে, কোনও মন্দির-মসজিদ-গীর্জা এগিয়ে আসে? তারা শুধু কতকগুলি অনুষ্ঠান করে। তারা বিপুল সম্পত্তির মালিক। এই ধর্মপ্রচারকরা একসময় অনাহারে ভিক্ষা করেছিলেন, মার খেয়েছেন, অনেককে খুনও হতে হয়েছে। আজ ধর্মপ্রচারকরা বিশাল সম্পত্তির মালিক। ধর্ম বলছে, ধনী-গরিব ভগবানের সৃষ্টি। এই দুনিয়ায় যা কিছু ঘটছে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিধানেই ঘটছে। দারিদ্র, অনাহারে মৃত্যু যা কিছু দুঃখকষ্ট সবই

পূর্বজন্মের কর্মফল। এসব হাসিমুখে সয়ে গেলে পরজন্মে তিনি মুখ তুলে তাকাবেন। ফলে ধর্মীয় পথে আজকের এসব সমস্যার সমাধান আছে কি?

বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি পথও কী সমাধান করছে তাতো চোখের সামনে দেখতেই পারছেন। তবু যারা সৎভাবে ধর্মকে কিছুটা মানে সাধারণ মানুষ, আমি মনে করি এখনও তারা আমাদের সাথে খানিকটা অন্যায়ের প্রতিবাদে আসবে। আমরা তাদেরকে চাই। তাদেরকে বোঝাতে হবে ধর্মীয় পথে বা পার্লামেন্টারি পথে এই সমস্যাগুলির সমাধান হবে কি? ফলে মার্কসবাদ চাই না এই কথা বলতে পারি কি? এইজন্য কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন ভারতবর্ষের জনগণকে মার্কসবাদ গ্রহণ করতে হবে। মার্কসবাদী পথেই বিপ্লব সংঘটিত করতে হবে। প্রশ্ন উঠবে, রাশিয়া, চীনে সমাজতন্ত্র হল, কিন্তু ধ্বংস হয়ে গেল তো। বিপ্লব হলে আবার ধ্বংস হবে না তার গ্যারান্টি কী? আমি এখানে প্রথমেই যেটা বলতে চাই যে ৭০ বছরের সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া দেখিয়ে দিয়েছে যে সমাজতন্ত্র কী দিতে পারে? যা দেখে পশ্চিমী দুনিয়ার এবং আমাদের দেশেরও যারা মার্কসবাদী বা কমিউনিস্ট নন, রম্যাঁ রলাঁ, বার্ণার্ড শ, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচাঁদ, সুভাষচন্দ্র, নজরুলরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের দেশে বা অন্যান্য কিছু বুর্জোয়া দেশে সিলেক্টেড বুদ্ধিজীবীরা সংবিধান রচনা করেছিল। রাশিয়ায় এমন গণতন্ত্র হয়েছিল যে, সেখানে সংবিধান রচনা করেছিল সেখানকার শ্রমিক-কৃষক। সংবিধান তৈরি করে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কৃষকের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তারা তাদের মতামত, সংশোধনী পাঠিয়েছিল। সেখানে একমাত্র শ্রমিক-কৃষক সহ সমস্ত ধরনের শ্রমজীবী মানুষ ইলেকশনে দাঁড়াতে পারত। ইলেক্টেড প্রতিনিধিকে ভোটারদের কাছে রিপোর্ট করতে হত যে কী কাজ করতে পেরেছে, কী কাজ করতে পারেনি। দরকার হলে রাইট টু রিকল-এর মাধ্যমে ভোটাররা তাকে সরিয়ে দিতে পারত। রাশিয়ায় কোনও বেকার ছিল না, সকলকেই কাজ দিয়েছিল। এমন কথাও বলেছিল, কাজ না করলে খাবার জুটবে না, সকলকে কাজ করতে হবে। কাজের সময় আট ঘণ্টার পরিবর্তে কমাতে কমাতে ছয় ঘন্টার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। সেখানে শ্রমিককে দুই ধরনের মজুরি দেওয়া হত। একটা হচ্ছে অর্থনৈতিক মজুরি, আরেকটা হচ্ছে সোস্যাল মজুরি। সোস্যাল মজুরিটা কারখানার ম্যানেজমেন্ট এবং শ্রমিকরা মিলে ঠিক করত রাষ্ট্রকে দেওয়ার জন্য। রাষ্ট্র সেই টাকা নিয়ে কী করত? জনগণের জন্যই ব্যয় করত। রাশিয়াতে অল্প ভাড়ায় ঘর, অল্প মূল্যে খাদ্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যেত। বিদ্যুৎ, জ্বালানি, জল পাওয়া যেত বিনামূল্যে। যানবাহনে যাতায়াত করা যেত বিনামূল্যে। রাশিয়ায় প্রাইমারি থেকে ইউনিভার্সিটি লেভেল পর্যন্ত শিক্ষা ছিল ফ্রি। সমস্ত চিকিৎসা ছিল ফ্রি। মহিলারা তাদের বাচ্চাদের ক্রেশে রেখে কাজ করতে পারত। বাচ্চাদের দায়িত্ব সরকার নিত। শ্রমিকদের জন্য পাহাড়ে,

সমুদ্রের ধারে স্বাস্থ্যনিবাস করেছিল, যাতে তারা ছুটি কাটাতে পারে। গ্রামে শহরে থিয়েটার মঞ্চ, সিনেমা হল ছিল বিনামূল্যে দেখার জন্য। লাইব্রেরি ছিল যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বই বিনা পয়সায় পড়া যেত। খেলা শেখাত বিনামূল্যে। বিজ্ঞানচর্চায় বিপুল ব্যয় করত। লেনিনের সময়ই রাশিয়া ঘোষণা করেছিল সমস্ত অস্ত্র ধ্বংস কর। আমাদের যুদ্ধের দরকার নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও সমস্ত রাষ্ট্রনায়কদের কাছে আহ্বান রেখেছিলেন স্ট্যালিন, সমস্ত অস্ত্র ধ্বংস কর, আমাদের যুদ্ধের দরকার নেই। সাম্রাজ্যবাদীরা রাজি হয় নি। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে নরনারীর সমানাধিকার, সমান বেতন এনেছিল। মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত। পিছিয়ে পড়া আদিবাসী যাদের অ্যালফাবেট (ভাষার হরফ) ছিল না তাদের অ্যালফাবেট তৈরি করে দিয়েছিল, বই ছাপিয়ে দিয়েছিল। অনেকগুলি উপজাতি মিলিয়ে রাষ্ট্র। প্রত্যেকের আবার আলাদা সংবিধান ছিল। অধিকার ছিল তারা চাইলে আলাদা হয়ে যেতে পারে। এইসব অধিকার নিয়ে এসেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। যা দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন হচ্ছে তীর্থস্থান, না এলে আমার জীবন ব্যর্থ হত। অমিয় চক্রবর্তীকে শেষজীবনে বলছেন, সোভিয়েত রাশিয়া পবিত্রভূমি, তপোবন। সেখানে স্থায়ী শান্তি ও আনন্দ পেয়েছি, একটা বিরাট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এটা হয়েছে। মানবজাতির বুকে শক্তিশেলের মতো ছিল যে লোভ এরা সেই লোভটাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে। নেতাজি বলেছেন, বিশ্বের বহু স্রোত-প্রতিস্রোতের মধ্যে দুইটি ধারা প্রধান। সাম্রাজ্যবাদ আর কমিউনিজম। ফ্যাসিবাদের পরাজয় মানেই কমিউনিজমের জয়। যুদ্ধে হারার পর নেতাজি সিঙ্গাপুর থেকে বলছেন, এখনও মার্শাল স্ট্যালিন বেঁচে আছেন। তাঁর ওপরেই নির্ভর করছে আগামী দিনের বিশ্ব কোন দিকে যাবে। খুবই শ্রদ্ধা করতেন স্ট্যালিনকে। এঁরা কেউই কমিউনিস্ট নন। সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমর্থন করলে যদি কমিউনিস্ট বলা হয়, বার্ণার্ড শ বলছেন তাহলে আমি কমিউনিস্ট। রম্যাঁ রলাঁ বলছেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস হলে শুধু সোভিয়েটের শ্রমিকরাই ক্রীতদাস হবে না, মানবসভ্যতা কয়েকযুগ পিছিয়ে যাবে। পৃথিবীতে নেমে আসবে অন্ধকার। বাস্তবে ঘটলও তাই। কেন সমাজতন্ত্র ধ্বংস হল তারও উত্তর মার্কস থেকে শুরু করে কমরেড শিবদাস ঘোষ দিয়ে গেছেন। মার্কস বলেছেন, সমাজতন্ত্র তার নিজের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে নেই, পুঁজিবাদের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের গর্ভে জন্ম নেয়। সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের জঠরের চিহ্ন অর্থাৎ অর্থনৈতিক, মানসিক এবং বুদ্ধিগত চিহ্ন বহন করে। এটা একটা ট্রানজিশনাল ফেজ, সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজম আসতে পারে, আবার সঠিকভাবে চালাতে না পারলে এটা পুঁজিবাদেও ফিরে যেতে পারে। লেনিন বলেছেন, পরাজয়ের পরে পুঁজিপতিদের শক্তি সহস্রগুণ বেড়ে যায়। শুধু বিদেশি সাহায্য নয়, পরাজিত

পুঁজিপতিরা থাকেই, তার সাথে যারা ইন্টেলেকচুয়াল, সামরিক বাহিনী, অফিসার মহল এরা পুঁজিবাদী ঘর থেকে এসেছে, সমাজতন্ত্রের মধ্যে এরা পুঁজিবাদী মানসিকতা বহন করে। পুঁজিবাদ মানুষের অভ্যাসের মধ্যে রয়ে যায়। স্ট্যালিন মৃত্যুর আগে গভীর উদ্বেগে বলে গেছেন, পুঁজিবাদ উচ্ছেদ হলেও পুঁজিবাদী অভ্যাস পুঁজিবাদী এথিক্স অ্যান্ড মরালিটি একটা ভয়াবহ শক্তি হিসাবে আছে। এটা সহজে যায় না। লেনিনবাদ বিরোধী শক্তি খুব সক্রিয় আমাদের দেশে, যেখানে আমরা দুর্বল সেখানেই তারা শক্তি সঞ্চয় করছে। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে যদি দুর্বল করা হয়, তাহলে পুঁজিবাদী চিন্তা বাড়বে। পার্টি এবং রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। কিছু সিম্পটম তিনি দেখেছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, বিপ্লবের দ্বারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন করছ, রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তন করছ, এটাই যথেষ্ট নয়। সুপারস্ট্রাকচার, মননজগতের পরিবর্তন চাই, কোটি কোটি মানুষ তো কমিউনিস্ট নয়, তারা তো মার্কসবাদী নয়, তাহলে তারা যদি কমিউনিস্ট-মার্কসবাদী না হয়, তাদের মধ্যে বুর্জোয়া চিন্তার ও সংস্কৃতির প্রভাব থাকবে। আচার-আচরণ-অভ্যাসে এসব থাকবে। ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনেই সবটা হবে না। সুপারস্ট্রাকচারে আলাদা বিপ্লব চাই তীব্র শ্রেণিসংগ্রামের পথে। তোমরা যখন বিপ্লব করেছ, তখন ব্যক্তিবাদ আপেক্ষিকভাবে প্রগতিশীল ছিল। কিন্তু বিপ্লবের পর সেই ব্যক্তিবাদ আর প্রগতিশীল নেই। সমাজতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের ফলে সেই ব্যক্তিবাদ সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদের জন্ম দিয়েছে। সমাজতন্ত্রকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহারের উপযোগী নতুন ধরনের এই ব্যক্তিবাদ, এটা একটা নতুন সমস্যা। এই ব্যক্তিবাদ থেকেও মুক্ত করতে হবে কমিউনিস্টদের জনগণকে। এখানেই পুঁজিবাদের বীজ রয়ে গেছে। চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেছিলেন, এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দুর্বলতা থাকছে। ব্যক্তিবাদের সমস্যা বোঝেনি। এটা ফাইট না করলে আবার সঙ্কট আসবে। রাশিয়া চিনে এই সঙ্কট হওয়া সত্ত্বেও, প্রতিবিপ্লব হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দলে কোনওরূপ হতাশা বা ভাঙন আসেনি। ১৯৪৮ সালেই তিনি দেখিয়েছিলেন, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মুভমেন্টের একটা সঙ্কট, সমাজতন্ত্রের সমর্থনে শক্তি বেড়েছে অনেক, বিস্তার হয়েছে অনেক, সেই অনুপাতে চেতনা বাড়েনি। ফলে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পরিবর্তে এসেছে যান্ত্রিক সম্পর্ক, যার থেকে এসেছে নেতৃত্বকে অন্ধের মত মানা। গোটা দুনিয়ায়, সোভিয়েটে, চিনের মধ্যে যেমন অন্ধের মত মানা, এই চেতনা এবং সংস্কৃতির অভাবের জন্য, মান যতটা উন্নত করা উচিত ছিল তা না করার জন্য, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনেও একই সঙ্কট এসেছিল। মস্কো কী বলছে, পিকিং কী বলছে — সেটা অন্ধের মত মানার অভ্যাস ছিল। আমাদের দলে এটা কখনও ছিল না। আমরা কখনও তথাকথিত মস্কোপন্থী, পিকিংপন্থী ছিলাম না। আমাদের

দল স্ট্যালিনকে মানে, মাও সে তুংকে মানে, কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁদের থেকে শিখেছেন, তাঁদের শ্রদ্ধা করতেন শিক্ষক হিসাবে, আমাদেরও সেভাবে শিখিয়েছেন, আবার রাশিয়া ও চীনের বক্তব্য কোনটা ঠিক, কোনটা ঠিক নয়, বিচার বিশ্লেষণ করে দেখাতেন। ফলে সমাজতন্ত্র ধ্বংস হওয়ায় আমরা দুঃখ-ব্যথা পেয়েছি, কিন্তু আমাদের দল ভাঙেনি, আমাদের দলে বিপর্যয় হয়নি। বরং আমরা এগোচ্ছি। কত বড় বড় পার্টি ছিল একসময়। আমাদের চেয়েও অনেক বেশি লড়াই করেছে তারা। ইটালি, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়ার পার্টি। এমনকি আজ যেখানে মৌলবাদের জোয়ার চলছে আফগানিস্থান, ইরান, ইরাক, মিশর এসব দেশে একসময় কমিউনিস্ট মুভমেন্টের বিরাট জোয়ার ছিল। রাশিয়া, চিনে সমাজতন্ত্র যেই প্রতিবিপ্লবে ধ্বংস হয়ে গেল, অন্য দেশের পার্টিগুলোও ভেঙে গেল। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা আমাদের পার্টিকে রক্ষা করেছে। এই পার্টি — মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভিত্তি করে তাকে আরও বিকশিত করে, উন্নত করে, সম্প্রসারিত করে কমরেড শিবদাস ঘোষ কঠিন কঠোর সংগ্রাম করে গড়ে তুলেছেন।

আমি কয়েকটা কথা বলে শেষ করব। ১৯৭৫ সালের সিউড়িতে একটি বক্তৃতায় বলেছেন, তখন তাঁর শরীর ভাঙছে, আপনাদের কাছে আছে সেই বক্তৃতা, তিনি বলছেন, ‘‘দীর্ঘ ৪২ বছর আমি রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। তার মধ্যে ত্রিশটা বছর আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করে এদেশে একটা নতুন ধরনের দল সত্যিকারের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী দল হিসাবে এস ইউ সি আই (সি) কে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করেছি। বয়স আমার খুব বেশি হয়নি। কিন্তু কর্মীদের তৈরি করার পিছনে, দলটা তৈরি করার পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমি ইতিমধ্যে অসুস্থ। ... আমি অসুস্থ, হাঁপিয়ে উঠেছি, খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর বেশি আপনাদের কাছে বলতে পারব না।’’ কোনও মিটিংয়ে তিনি এরকম বলেননি। ১৯৭৬ সালে কর্ণাটকে তখনও পার্টির কাজকর্ম নিয়মিত শুরু হয়নি। একটা বৈঠক করতে আমি সেখানে যাই। আমার একটা দ্বিধা ছিল ইংরাজিতে প্রফেসরদের সাথে আলোচনা করার ব্যাপারে। তিনি খুব উৎসাহ দিলেন। বললেন, খুব বলিষ্ঠভাবে সত্য কথা বলবে। আমি গেলাম, মিটিং করলাম। অন্ধ্রের কুরনুলে কিছু নতুন ছেলের সাথে আমি অ্যারেস্টেড হয়ে গেলাম। তখন জরুরি অবস্থা। আমি আমার জন্য ভয় পাইনি। নতুন ছেলেরা এসেছিল। হয়তো বোমা তৈরির কেস দিয়ে কয়েক বছরের জন্য জেলে আটকে দেবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ একটা কথা বলতেন — বিপদে, ঝঞ্ঝাটে পড়লে খুব ধীরস্থির, শান্তভাবে ঠিক করবে কী করতে হবে। এই কথাটা আমার মনে ছিল। তখন আমি বুদ্ধি প্রয়োগ করে নিজেও বেরিয়ে এলাম, তাদেরকেও বের করে নিয়ে এলাম। এই কাজটার জন্য মনটা আমার তখন খুব ভাল ছিল। সকালবেলা অফিসে এসেছি। কমরেড শচীন ব্যানার্জী অফিসে

ছিলেন। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী করেছি। আমি সব বললাম। ওঁনার কাছ থেকে কমরেড শিবদাস ঘোষ শুনেছেন। বিকালবেলা অফিসে এসে আমার সাথে দেখা হওয়ার পরে বললেন, খুব তো ভাল করেছ। উনি খুশি হয়েছেন বুঝলাম। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আপনাকে আর ১০বছর পেলে আমরা ভারতবর্ষ জয় করতে পারব। শুনে আমার দিকে একটু তাকিয়ে রইলেন, সে চাহনি সম্পূর্ণ আলাদা, এখনও আমার চোখে ভাসে। বললেন, যা রেখে গেলাম, তোমরা পারবে না? আমি বললাম, নিশ্চয়ই পারব। এই যে আমি কাজ করি, তাঁর নানা বক্তব্য, আবেদন, এই চাহনি আমার পিছনে তাড়া করে বেড়ায়। কতটা পারলাম, না পারলাম ইতিহাস বলবে। মৃত্যুর সময়ে আমরা ছিলাম, দেখেছি, প্রথমে কমরেড শচীন ব্যানার্জীকে ডাকলেন। হাত ধরলেন, শচীনদা কেঁদে ফেললেন। তারপর আমাকে ডাকলেন, আমি ভয়ে গেলাম না। কারণ আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারতাম না। শেষ সময়ে আমরা যারা ছিলাম, আমাদের দিকে চোখ মেলে একবার তাকালেন। যে ডাক্তার কাঁদছেন, তার বুকে হাতটা বুলিয়ে দিলেন। এই যে আমাদের দিকে তাকালেন, আমি অন্তত বুঝেছি, আমাদের থেকে ভরসা পেতে চাইছিলেন, যে আমরা বিপ্লবের দায়িত্ব বহন করে যাব। সেজন্যই তাকিয়ে ছিলেন। ওঁনার মৃত্যুর পরে সবাই কাঁদছিল, আমি কাঁদতে পারিনি। কাঁদছিলাম, কমরেড নীহার মুখার্জী পিঠে হাত দিয়ে বললেন, অফিসে যাও, সব জায়গায় খবর দাও কালকের শোকযাত্রার জন্য। তখন আমার মনে পড়ে গেল, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর শোকযাত্রার শৃঙ্খলা যারা দেখেছে, তাদের মধ্যে পার্টি সম্পর্কে খুব আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখেছেন যেখানে গ্রামের নতুন কৃষকরা এসেছে, সেখানে একটু এলোমেলো ছিল। পরদিন অফিসে আমাকে বলেছিলেন, পরবর্তী শোকযাত্রা যখন হবে নতুন লোক এলে সেখানে ভলান্টিয়ার রাখবে। নীহার মুখার্জী যখন আমাকে পাঠালেন, আমার ঐ কথাটা মনে পড়ল। এই মহান বিপ্লবী চেয়েছেন, তাঁর শবদেহ বাহিত শোকযাত্রাটাও যেন শৃঙ্খলা, সংস্কৃতির দ্বারা মানুষকে স্পর্শ করে, দল সম্পর্কে মানুষকে আকর্ষণ করে। বিপ্লবের সাথে কতটা একাত্ম হলে এভাবে ভাবা সম্ভব! তিনি থাকবেন না, কিন্তু তাঁর শবদেহ বাহিত মিছিলও যেন বিপ্লবের স্বার্থে কাজে লাগে। একবার ভেবে দেখুন! এখন আমাদের কমরেডরা নানা জায়গায় মিটিং করছেন। নানা বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন। কেউ কেউ হয়তো ভালই বলছে, প্রশংসাও পাচ্ছে। কারও কারও মধ্যে বুর্জোয়া চিন্তার প্রভাবে ব্যক্তিগত নাম করার ঝোঁকও বাড়ছে। মনে পড়ে, মৃত্যুর চারদিন আগে উনি বলেছিলেন সকালবেলায় সঙ্গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে, প্রথমে রবিশঙ্কর আর ইহুদি মেনহুইনের সুর নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কোনটা মনকে স্পর্শ করে। আমি তখনও তার তাৎপর্য বুঝিনি। ওঁনার খাবার দেরি হচ্ছে, তখন তাঁর স্বাস্থ্যও

খারাপ। ওখানকার কমরেডরা তাগাদা দিচ্ছেন। আমাদের বললেন, তোমরা একটু ওয়েট কর, আবার কথা বলব। খাবার পর আবার ডাকলেন। তখন একটা কথা বলেছিলেন, সেটা শুধু আমার জন্য নয়, সকলের জন্য বলছি। বলেছিলেন, আমি যা বক্তৃতা দিচ্ছি, এগুলো পড়ে মুখস্থ করে বললে তোমরা হাততালি পাবে, প্রশংসা পাবে। কিন্তু কাজ হবে না। আমি হৃদয়ের যে ব্যথার থেকে এইসব জিনিসগুলি ভেবেছি, বুঝেছি এবং বলছি, তোমাদের হৃদয়ে যদি সেই ব্যথা না থাকে, সেই অনুভূতি না থাকে, তাহলে কাজ হবে না। কমরেডস, শেষদিকের এইসব কথাগুলিকে মনে রেখেই কমরেড শিবদাস ঘোষকে স্মরণ করছি, আপনাদেরও স্মরণ করতে বলছি।

জীবনের প্রতি পদক্ষেপে উনি বলতেন, সকলের কাছ থেকে শেখো, আমি রাস্তার লোকের কাছ থেকেও শিখি। রাস্তার লোকের থেকে কী শিখছেন তাও আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। অনেক কিছু জেনে গেছি, অনেক কিছু বুঝে গেছি, এই ভাবটা যেন কখনও না আসে। আর ঘরে বাইরে আচার আচরণে উচ্চ সংস্কৃতির প্রতিনিধি হতে হবে আমাদের। তিনি বলতেন, বিপ্লবী রাজনীতির প্রাণ, উন্নত সংস্কৃতির মান। ওঁনার একটা বক্তৃতাও নেই যেখানে রুচি-সংস্কৃতি-উন্নত চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেননি। আমাদের কমরেডরা এখন যারা কাজ করছেন, তাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই। কারণ আমি জানি, আমি ও আমরা যে সমাজ পেয়েছি, সেই সমাজ এখন নেই। এখনকার সমাজ অনেক পাল্টে গেছে, পরিবেশ পাল্টে গেছে এবং এখনকার যে প্রভাব, কোনওটাই বিপ্লবী হওয়ার অনুকূল নয়। সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক পচন ধরেছে। আমাদের ছোটবেলায় এইরকম ছিল না। ফলে আজকের দিনে নিজেকে রক্ষা করার লড়াই অনেক কঠিন। কিন্তু লড়তে তো হবে। বড় চরিত্রের অধিকারী তো হতে হবে। প্রতিদিন যেমন আমার শরীরে ধুলা পড়ে, তা পরিষ্কার করতে স্নান করতে হয়, সাবান মাখতে হয়। মনেও এরকম ধুলা পড়ে, মনকেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। চোখ-কান দিয়ে যা দেখছি, শুনছি, মন দিয়ে যা ভাবছি কোনটা বিপ্লবী হওয়ার পক্ষে উপযোগী, কোনটা ক্ষতিকারক, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে তাকে বিচার করতে হবে। আবার ভারতবর্ষের সঙ্কট, বিশ্বের সঙ্কট, নীতিনৈতিকতার সঙ্কট যা কিছু হোক, জীবনের নানা জ্বালাযন্ত্রণা মানুষকে বারবার রাস্তায় নামাচ্ছে। কোনও পার্টি নেই, কোনও নেতা নেই। দিল্লিতে যে কিসান আন্দোলন চলছে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে লড়ে যাচ্ছে। প্রায় হাজার খানেক লোক মারাই গেল ওখানে লড়তে গিয়ে। তবুও সরছে না। এই চিত্র আগে ছিল না। আমেরিকায় অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট, দিল্লিতে শাহিনবাগ মুভমেন্ট, ইউরোপেও বারবার আন্দোলনের জোয়ার আসছে — এগুলি আরেকটা চিত্র। কিন্তু মানুষের রাস্তা জানা নেই। এই আন্দোলনে নেতা নেই, আদর্শ

নেই, সংস্কৃতি নেই। এই আন্দোলন তার নেতৃত্ব চাইছে। আমরা দিল্লির আন্দোলনে সমস্ত শক্তি নিয়ে আছি। শাহিনবাগ মুভমেন্টেও আমরা ছিলাম। বিশ্বের নানা আন্দোলনকে আমরা সমর্থন জানাচ্ছি। এই দল বাড়লে, আমাদের দলের যথার্থ শক্তিবৃদ্ধি আদর্শগত, সংগঠনগত নীতিগত শক্তিবৃদ্ধি দিয়েই ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলন যদি আমরা শক্তিশালী রূপে গড়ে তুলতে পারি তার প্রভাব বাইরেও আমরা ফেলতে পারব। আগামী দিনের বিশ্ববিপ্লব কিন্তু আমাদের দলের অগ্রগতির উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। ডোন্ট ফরগেট, যে ভূমিকা একসময় রাশিয়ান পার্টি নিয়েছিল, চিনের পার্টি নিয়েছিল, ঐতিহাসিকভাবে একই ভূমিকা আমাদের ওপরেও বর্তেছে। আমরা যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা অনুযায়ী আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি, তাহলেই একমাত্র এটা সম্ভব হবে। ফলে তরুণ কর্মীদের কাছে আমার বিশেষ আহ্বান, তারা বড় হোন, যথার্থ যোগ্য হোন, শিবদাস ঘোষের উত্তরসাধক হোন! এই যে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী মারা গেলেন, কী শ্রদ্ধাঞ্জলি সেদেশের মানুষ ব্যক্ত করেছে। এটাই তো প্রাপ্তি। জীবনে টাকাপয়সা, গাড়িবাড়ি, রোজগেরে স্বামী, সুন্দরী স্ত্রী — এসবের কী মূল্য আছে? পাশের বাড়ির লোকটাও তো খোঁজ নেয় না। জীবিত থেকেও মৃত। কিন্তু বুদ্ধ, হজরত মহম্মদ, যীশুখৃষ্ট তো আজও জীবিত। বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য বড় মানুষেরা জীবিত। ইউরোপের মনীষীরা জীবিত। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং-কমরেড শিবদাস ঘোষও জীবিত। একদল বেঁচে থেকেও মরে থাকে। আরেক দল মৃত, কিন্তু জীবন্ত শক্তি রূপে ক্রিয়া করে। যদি যথার্থ মানুষের মত মানুষ হওয়া যায়। ফলে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা নিয়ে সকলেই মাথা তুলে দাঁড়াবে, আরও বড় হবে, এগিয়ে যাবে এই আবেদন রেখেই আজকে আমি এখানে শেষ করলাম।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) জিন্দাবাদ
সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ লাল সেলাম